(universal law) কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে আমাদের ন্যায় সংস্পৃষ্ট (concerned) লোকের কর্ত্তব্য, যাহাতে আমরা ঐরূপ বিভিন্ন মত ও প্রণালী অবলম্বন করিয়াও এবং আমাদের স্বভাবজাত ন্যায় ও সত্য বুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া, জাগতিক ব্যাপারের অবিরাম ও অপ্রতিহত সংঘর্ষে উদ্রিক্ত নূতন তত্ত্বালোকের ক্ষীণ কিরণরাশি অবলোকন করি এবং সেই নবালোকোদ্ভাসিত পথ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়া আমাদের অন্তরগুরুর মহদাদেশ পালন করি। এস্থলে রাজনৈতিকদলের অনপকারিতা সম্বন্ধে এমন একজন প্রসিদ্ধ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির কতকগুলি উক্তি উদ্ধার করিব, যিনি কোনও প্রকার রাজনৈতিকদলের সহিতই সংস্পৃষ্ট ছিলেন না, অথচ যাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ উক্তি, অভিমত ও সিদ্ধান্ত অনেক বিষয়ে সভ্যজগতের অনেকস্থলেই বেদবাক্যের ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে। তিনি বলেন :—

"Parties are also founded on instincts, and have better guides to their own humble aims than the sagacity of their leaders. They have nothing perverse in their origin, but rudely mark some real and lasting relation. We might as well wisely reprove the east wind, or the frost, as a political party, whose members, for the most part, could give no account of their position, but stand for the defence of those interests in which they find themselves." [Emerson.]

যাহা হউক, এক্ষণে এই সকল দার্শনিক-পর্য্যালোচনা ছাড়িয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয়গুলির বিচারে প্রবৃত্ত হই। অধুনা আমাদের দেশে প্রধানতঃ যে দুইটী রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থানে আমাদের দেশে ও বিদেশে নানা জাতীয় লোকের মধ্যে নরম ও গরম সমালোচনা (favourable and adverse criticism) চলিয়াছে, তাহার প্রকৃতি, কার্য্যপ্রণালী, উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী উভয়েরই উদ্দেশ্য মূলতঃ ও স্থূলতঃ এক—স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করা। উভয় দলই চাহেন, দেশের বর্ত্তমান দুঃখ দুর্গতি অপনোদন করিয়া ইহার পূর্ব্বতন গৌরবশ্রী পুনঃস্থাপন করিতে। উভয়েই চাহেন, ভারতের পূর্ব্বশিল্প পুনরুদ্ধার হউক, উভয়েই চাহেন, ভারতের পূর্ব্বরাজ্য-গৌরব ফিরিয়া আসুক, উভয়েই চাহেন, ভারতের অর্থে ভারতের প্রজাবৃন্দ সুখ, স্বচ্ছন্দতায় ও শ্রীবৃদ্ধিতে প্রতিপালিত হউক, উভয়েই চাহেন, ভারতের সন্তান জাতীয় প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া জাতীয় অভাব অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য ও জাতীয় কর্ত্তব্য সম্যক্‌রূপে পালন করিবার জন্য উপযোগী হউক, উভয়েই চাহেন, ভারতের রাজশাসন ভার প্রধানতঃ (বা সম্ভব হইলে সম্পূর্ণতঃ) ভারতীয়ের হস্তে ন্যস্ত হউক। এই সকল মূল বিষয়ে উভয় দলের মধ্যে বিশেষ কোনও রূপ বিরোধ নাই বা থাকা উচিত নয়। কিন্তু তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রণালী সম্বন্ধে কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে গুরুতর মতগত ও কার্য্যগত প্রভেদ (theoretical and practical differences) আছে। যাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে (বোধ হয় শুধু পুরাতনত্ব ও সনাতনত্বেরই গুণে) সাধারণতঃ পুরাতন ভাব ও মত লইয়া এবং পুরাতন প্রথা ও প্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন (অর্থাৎ যাঁহাদিগকে সাধারণতঃ মধ্যপন্থী, ধীরপন্থী বা moderates নামে অভিহিত করা হয়),

তাঁহারা বলেন :—আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য, দেশকে উন্নত করার জন্য যথাসম্ভব আমাদিগের শাসকবর্গেরই অনুকম্পা ও সাহায্যাপেক্ষী হইয়া চলিব এবং আমাদের দুঃখ দুর্গতির কথা তাঁহাদিগের সমীপে নিবেদন করিয়া তাঁহাদের দয়া ও সহানুভূতির উদ্রেক কবিব। কিন্তু যাঁহারা নূতন রাজনৈতিক আদর্শাবলম্বী ও নূতন পন্থানুসারী (অর্থাৎ, যাঁহাদিগকে সাধারণতঃ চরমপন্থী বা extremists নামে বরণ করা হয়,) তাঁহাদের মত অন্যরূপ, তাঁহাবা বলেন :—অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর হইতে আমরা আমাদের রাজকীয় প্রভুদের নিকট নানাভাবে আবেদন ও নিবেদন কবিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহাতে আমাদেব দুঃখ ও দৈন্যের বড কিছু উপশম হয় নাই; তাহা ছাডা, সর্ব্ববিষয়ে আমাদের শাসয়িতাদিগের গলগ্রহ হইয়া পড়ায়, আমরা ক্রমশঃ শক্তিহীন, উদ্যমহীন ও সাহসহীন হইয়া পডিতেছি। এক্ষণে আমাদিগকে আমাদেরই পায়ে ভর দিয়া দাঁডাইতে আবম্ভ করিতে হইবে এবং আমাদের জাতীয় দুঃখদুর্গতি দূর করিতে আমাদেরই নিজশক্তি, নিজবুদ্ধি, নিজ গবেষণা নিয়োগ করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতির নিয়তি, শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও, প্রধানতঃ নিজ শক্তি, জ্ঞান ও চেষ্টার সমীচীন প্রয়োগের উপর নির্ভর করে—ইহা ইতিহাস-প্রমাণিত চিরন্তন সত্য। পৃথিবীর সকল জাতির উত্থান ও উন্নতি এই নিয়ম-অনুসারেই সংসাধিত হইয়াছে এবং প্রবল শক্তি-সম্পন্ন আর্য্যজাতির বংশধর ভারতীয়ের বর্ত্তমান বাসভূমে এই মহানিয়মের ব্যত্যয় ঘটিবে—একথা বলিবার বোধ হয় এখনও উপযুক্ত সময় ও কারণ আসে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই দুই পৃথকদলের সৃষ্টির জন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই, কেননা, এরূপ পার্থক্য ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ক্রম-বিভাগের একটা নিদর্শন মাত্র। প্রত্যেক জাতির জীবনক্ষেত্রে এইরূপ পার্থক্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পার্থক্যের বর্ত্তমানতা অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মানবজীবন ও মানবজীবনের ইতিহাস এত বৈচিত্র্যযুক্ত ও জটিলতাপূর্ণ। তাবপর, বৈবর্ত্তনিক যুক্তি ছাড়িয়া দিয়াও, আমাদেব দেশের এই দুই বিভিন্ন বাজনৈতিক দলেব সৃষ্টি ও স্থায়িত্ব অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পাবে। সকলেই জানেন, স্থিতিশীলতাব প্রতি মানবের একটা যেন স্বাভাবিক আসক্তি আছে। (conservatism is an undeniable fact of human nature). সেই জন্য প্রত্যেক জাতির জীবনের প্রত্যেক বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরিবর্ত্তনরূপ মহানিয়মের কার্য্যকারিতার সঙ্গে সঙ্গেই স্থিতিশীলতার দিকেও একটা প্রবল আনুরক্তি ও গতি রহিয়াছে। সেইজন্যই মানবসমাজের সংস্কার কার্য্য যত সহজ মনে করা যায়, বাস্তবিক কার্য্যতঃ তত সহজে সংসাধিত হয় না। যাহা ছিল এবং যাহা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই সঙ্গত ও সমীচীন, একথা মানুষ যত জোরে ও যতবার বলে, আর কোনও বিষয়েই সেরূপ বলে না। ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে দেখুন, এই রক্ষণশীলতার প্রভাব কিরূপ প্রবল। আজ এই বিংশ শতাব্দীর নবালোকোদ্ভাসিত যুগেও অনেক খ্রীষ্টশিষ্য অনন্ত নরকের মহিমা প্রচার করিতে বিরত হইতেছেন না; অনেক আর্য্যনামদৃপ্ত কৃতবিদ্য ভারত-সন্তানও জাতিভেদ ও বাল্য-বিবাহ বাক্যে ও কার্য্যে প্রকাশ্য সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। সেদিন

বিলাতপ্রত্যাগত বেহারের সুসন্তান শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর লালের প্রতি অনেক সম্ভ্রান্ত-বেহারীর কঠোর আচরণ বিষয় সমালোচনা করিতে যাইয়া শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বেঙ্গলী" পত্রে প্রসঙ্গ ক্রমে লিখিয়াছিলেন যে, আমাদের ধর্ম্মটা আমাদের সাময়িক প্রয়োজনীয়তানুসারে পুনর্গঠিত হওয়া উচিত। এই কথা গুলি শুনিয়া বেহারের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্মকাতর ভূম্যধিকারী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন:— কি দুঃখের কথা, আমাদিগের হিন্দুধর্ম্মের মত সনাতন-ধর্ম্মেরও কি পরিবর্ত্তন দরকার! রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে ও (বিশেষ ভাবে ইংলণ্ডের ন্যায় এক-নায়কত্বপ্রধান রাজ্যে) এই ব্যাপার। প্রজাসাধারণের উন্নতি ও সুখ-কল্পে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অভিনেতাদিগকে যে কিরূপ পরিশ্রম স্বীকার, উৎপীড়ন সহ্য ও সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহা ইতিহাসাভিজ্ঞ সকল ব্যক্তিই অবগত আছেন। তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের গতিরোধকারী শক্তি শুধু মানবের স্বাভাবিক স্থিতিশীলতাই নয়; অনেক সময় ইহার সহিত আরও দুই একটী ব্যাপার প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে জড়িত থাকে এবং কখনও বা স্থিতিশীলতার কারণীভূত হইয়া থাকে। সেগুলি (১) স্বার্থ-বিনাশের ভয়, (২) মান বা ইজ্জৎ সংরক্ষণের আত্যন্তিক ইচ্ছা। আমাদের সমাজে যে ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা অনেক অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারেরও বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, তাহার মূলে অধিকাংশস্থলেই এই দুইটী কারণ প্রধানতঃ বর্ত্তমান থাকে। গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন-বিমুখতা ও সংস্কারোপেক্ষার নিম্নেও অনেক সময় এই দুইটী কারণ বর্ত্তমান থাকে। শাসয়িতাদিগের মধ্যে অনেকেরই বোধ হয় এই ধারণা যে, শাসিতদিগের প্রার্থনানুযায়ী রাজকীয় শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে গেলে হয়তো তাহাদের আবেদন ও দাবীর সংখ্যা এত বাড়িবে যে, প্রজানুকূল হইতে গেলে হয়তো পরিশেষে গবর্ণমেণ্টের কিছু গুরুতর ক্ষতি ঘটিবে। তার সঙ্গে আর একটী কারণ সম্বন্ধে তো বর্ত্তমান রাজনৈতিক ইতিহাস-পাঠকের কোনও রূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না, কেননা, আমরা জানি যে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা ইজ্জতের (prestige) দোহাই দিয়া দুই একটী গুরুতর ভ্রান্তিমূলক কার্য্যেরও পোষকতা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনেক পাঠক হয়তো একটু রুষ্ট হইবেন, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে, আমাদের দেশের মধ্যপন্থীদিগকে (moderates) কতকপরিমাণে স্থিতিশীল (conservatives) বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; কতক পরিমাণে বলিতেছি এইজন্য যে, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে মধ্যপন্থী নাম লইয়া এবং ঐ দলের মধ্যে থাকিয়াও বাক্যতঃ এবং কার্য্যতঃ অপর দলের নীতি এবং কার্য্য প্রণালীর সহিত একমত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই মধ্যপন্থীদিগের অনেকেরই ধারণা, আমরা পূর্ব্ব হইতে যে পথ অনুসরণ করিয়া আসিতেছি, সে পথ অনেকদিনের বলিয়াই শ্রেয়ঃ ও অনুসরণীয়, এবং সাধারণ স্থিতিশীলতা-বাদীদিগের ন্যায় তাঁহারা উহার বিরুদ্ধে কোনও রূপ নূতন-যুক্তি শুনিতে অনিচ্ছুক। ইহা ছাড়া বোধ হয় উপরোক্ত কারণ দুইটীও তাঁহাদের মধ্যে অনেকের স্থিতিশীলতা বা মন্থরগামিতার হেতু হইতে পারে। কেননা, অনেকেরই এরূপ

ধারণা হওয়া সম্ভব যে, হয়তো তাঁহাদের ক্ষিপ্রগামিতা ও রাজকীয় কার্য্যের ব্যক্ত প্রতিবাদে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ হারাইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত ভক্ত বন্ধুবর্গের নিকটও পসার হারাইবেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আজকাল এই রাজনৈতিক দলেরই গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু (যদিও খুব সামান্য) আদর ও প্রতিপত্তি আছে এবং ভবিষ্যতেও কিছু থাকিবে। কিন্তু আমাদের দেশে দ্বার-কার্য্যে নিযুক্ত মহারথীদের যোগ্যতা কি শুধুই বা প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের মনস্তুষ্টিরই উপর নির্ভর করিবে? এরূপ কার্য্যে যৌক্তিকতা, সময়োপযোগীতা, ইতিহাস-সাপেক্ষ্যতা ও ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রেরণার স্থান কি উচ্চতর ও মহত্তর বলিয়া বিবেচিত হইবে না? কোন্ দেশে কোন্ সময়ে রাজনৈতিক কার্য্য শুধু বা প্রধানতঃ কর্তৃপক্ষের মনরক্ষা করিয়া সম্পাদিত হইয়াছে? আমি বলিতেছি না যে, শুধু শুধু গবর্ণমেণ্টের আক্রোশভাজন হওয়াটা আমাদের উদ্দেশ্য-সাধনপক্ষে বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় বা উপযোগী। বরঞ্চ আমার মতে, যতদূর সম্ভব, গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন না হইয়া কার্য্য করিতে পারিলেই ভাল। তবে গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন না হওয়াটা যদি আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের রাজনৈতিক কার্য্য কখনই সুচারুরূপে ও প্রকৃতভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না এবং ক্রমশঃ উহা শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে একেবারে বিলুপ্ত হইবে। হে স্বদেশ-সেবক, তুমি মুখ ফুটিয়া বল আর না বল, তোমাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের স্বদেশোদ্ধার যদি একটা মহৎ কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে সে কার্য্যে আমাদিগকে সমগ্র প্রাণের সহিত প্রবেশ করিতে হইবে, সে কার্য্যে স্বার্থ ও নীচ ভয়-বিরত হইয়া যোগদান করিতে হইবে, সে কার্য্যে সকল প্রকার সঙ্গত ও সমীচীন উপায় নিয়োগ করিতে হইবে, অল্পকথায়, সে কার্য্যে উৎসাহ, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের চরমসীমায় উপস্থিত হইতে হইবে। বড় দুঃখের বিষয় যে, এই রাজনৈতিক-দলকে অযৌক্তিক, ক্রূরনীতি-পরায়ণ, দুষ্টপ্রকৃতি ইত্যাদি আখ্যা দিয়া গবর্ণমেণ্ট ও অপর দলান্তবর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত শুভানুধ্যায়িগণ তাঁহাদের মূল্য ও মর্য্যাদা খর্ব্ব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বযুগেই সাধারণ জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রগামী ভীতিনিরপেক্ষ নব্য ও উন্নতভাবাপন্ন দলকেই এইরূপ অপবাদ ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে, ইতিহাস সে বিষয়ে ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে এই নব্যভাব ও প্রণালী-অবলম্বী আশুপরিবর্ত্তন-প্রয়াসী দলটীকেও এই দশায় পড়িতে হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। এই নব্য রাজনৈতিক দলের অভিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালীর (programme) কোনও রূপ অযৌক্তিকতার চিহ্ন আমরা তো এ পর্য্যন্ত আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা খুজিয়া পাই নাই। কেননা, আমরা জানি যে কোনও একটা নিয়ম বা প্রণালীর প্রণয়ন বা প্রয়োগ কোনও একটী বিশেষরূপ অবস্থানিচয়ের সহিত জড়িত। একটা উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে; এক প্রকার অবস্থাবলীর বর্ত্তমানতায় একটা বিশেষ উপায় বা প্রণালীর ভিতর দিয়া যাইতে হইবে; এবং অবস্থাবিপর্য্যয়ে একই উদ্দেশ্য সাধনার্থে অন্য একটা উপায় বা প্রণালীর

অবলম্বন বিধেয়। একজন কোনও একটী বিশেষ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে; চিকিৎসকের উদ্দেশ্য এক—রোগীর রোগ সারান, কিন্তু রোগীর শারীরিক অবস্থা বিশেষে অনেক প্রকারের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়া থাকে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের অভিনেতাগণ একটা বিশেষ প্রকার রাজনৈতিক কার্য্য প্রণালী উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন হয়তো আমাদের রাজনৈতিক চিকিৎসকগণ ভাবিয়াছিলেন যে, ঐরূপ উপসর্গ থাকায় ঐরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থাই সমীচীন। কিন্তু যদি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, ঐরূপ ব্যবস্থায় দেশরূপ রোগীর উপসর্গগুলির বিশেষ কোনও আশাপ্রদ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, এবং রোগীর দেহে শক্তি ও সুস্থতার চিহ্ন বড় একটা পরিলক্ষিত হয় নাই, তাহা হইলে কি সুচিকিৎসকের একটা অনুসন্ধিৎসা ও প্রয়োগফলজ্ঞানেচ্ছার (curiosity and experimentation) খাতিরেও একটা নূতন ব্যবস্থার আয়োজন করা উচিত নয়? আমাদের দেশে যে রাজনৈতিকদলটীকে চরমপন্থী বলা হয়, তাঁহারা বিশ বৎসর পর্য্যন্ত একই কার্য্যপ্রণালীর বিশেষ কোনও রূপই কৃতকার্য্যতা না দেখিতে পাইয়াই অন্য প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, এবং দেশের সকলেরই কর্ত্তব্য, ইঁহাদের এই নবোদ্ভাবিত প্রণালীর কার্য্যকারিতা ও সমীচীনতা পরীক্ষার জন্য ধীরভাবে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া দেখেন; নতুবা যদি আমরা শুধু এই প্রণালীর নূতনতা ও বিভিন্নতা দেখিয়াই ইহার ফল ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হই, তাহা হইলে ইহা অন্ধতা, অনুদারতা ও অর্ব্বাচীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দলের সপক্ষে সর্ব্বপ্রধান যুক্তি এই যে, ইহাদের কার্য্যপ্রণালী মানবের সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমগ্র মানব ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত। যে স্বাবলম্বন-নীতি ইঁহাদের কার্য্যাবলীর ভিত্তি ও বিশেষত্ব, তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগেই স্বদেশোদ্ধার-কার্য্য-নেতাদিগের প্রধান যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাঁহাদের অভীপ্সিত সুফল আনয়ন করিয়াছে। বিশেষভাবে এই বর্ত্তমান যুগে সভ্যজগতের চারিদিক হইতেই দৈনিক সকল প্রকার কার্য্যেই স্বাবলম্বনের উপযোগিতা সুস্পষ্টভাবে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। মার্কিন ঋষি মহাত্মা ইমার্সন বলেন,—

"It is only as a man puts off all foreign support, and stands alone, that I see him to be strong and to prevail * * * A who knows that power is inborn, that he is weak because he has looked for good out of him and elsewhere, and so perceiving throws himself unhesitatingly on his thought, instantly rights himself, stands in the erect position, commands his limbs, works miracles, just as a man who stands on his feet is stronger than a man who stands on his head."

শুধু ব্যক্তি জীবনের নয়, জাতীয় জীবনেরও সর্ব্ববিভাগে ইহার আবশ্যকতা এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ যে আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক দিকে সজীবতা ও সুশৃঙ্খলতার অনেক চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহা কেবল এই স্বাবলম্বন প্রণালী কতক পরিমাণে অনুসরণ করার ফল এবং এই স্বায়ত্তনীতি যে পরিমাণে অনুসৃত ও বিস্তৃত হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের জাতীয় জীবন সুশ্রী, সবল ও সুগঠিত

হইবে। একথা আজকাল আমাদের মধ্যে প্রায় সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করার প্রধান হেতু এই যে, আমাদের পুরাতন রাজনৈতিক প্রণালীগুলির উপযোগীতা ও কার্য্যকারিতা আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই যুক্তির সত্যতা আমরা পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়া থাকি আর নাই থাকি, বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির পর হইতে আমরা উহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বরিশালে যখন আমাদের সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক নেতাদিগের প্রতি বৃটিশ-বর্ব্বরের অমানুষিক অত্যাচার হয়, তখন অনেক ধীরপন্থিকেই এই মর্ম্মান্তিক অভিবেদন জ্ঞাপন করিতে হইয়াছিল--"There is no responsible Government in the land"। তারপর দেশে যত কিছু শাসন-ও-শাসিত-সম্পর্কিত আন্দোলন-সূচক ব্যাপার ঘটিয়াছে, ব্যবস্থাপক-সভায় যে সকল নিদ্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়াছে, ভারত-সচিবের দপ্তর হইতে যে সব মন্তব্য ও আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক ব্যাপারেই আমাদের পূর্ব্বতন রাজনৈতিক প্রণালীর নিষ্ফলতা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রাণতা ও সত্যানুগামিতার দৃষ্টান্তও এই দলভুক্ত লোকের কার্য্য ও আচরণেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কেননা, চতুর্দ্দিকের বিপদ ও বাধা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের পবিত্র ও কঠিন ব্রত অসীম সাহস ও উদ্যমের সহিত সম্পন্ন করিতেছেন, ইহা গভীর ধর্ম্মভাব ও দৃঢ় সত্য পালনেচ্ছা ব্যতিরেকে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কর্ম্মবীর ভূপেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের ন্যায় অকৃত্রিম ধর্ম্মপরায়ণতা ও সত্যব্রতানুগামিতার জলন্ত উদাহরণ বর্ত্তমান যুগে অতি বিরল। এই নূতন দলের দিকে যৌক্তিকতা, মানব ইতিহাসের সাক্ষ্য, ধর্ম্মানুগামিতা ও ঐকান্তিকতা আছে বলিয়াই দেশে এই দলের প্রতি ক্রমশঃ লোকের আনুরক্তি ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইতেছে ; এবং গবর্ণমেণ্টও এই নূতন দলটীকে ক্ষীণ ও খর্ব্ব করিবার নানারূপ উপায় ও কৌশলচিন্তায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কিন্তু বুঝিতেছেন না যে, সত্য ও ন্যায়ের বীজ একবার উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইলে, তাহা কিছুতেই ধ্বংস পাইবার নয়। বলা বাহুল্য যে, আমরা চরমপন্থী বলিলে কলহ বিদ্বেষ ও উদ্ধত-পন্থী বুঝিনা। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, এই দলের মধ্যে কেহ কেহ অযথা বিবাদ ও বিসম্বাদ দোষে অভিযুক্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের ভাব ও আচরণের দ্বারা তাঁহাদের কার্য্য ও প্রণালীর প্রতি অনেকেরই অসন্তোষ এবং অপবাদের উদ্রেক করিয়াছেন ; কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, এসব ব্যাপার তাঁহাদের মত, কার্য্যপ্রণালী এবং উক্তির অন্তর্ভূত নয়। এজন্য চরমপন্থীদলের লোকেরাও যেরূপ দোষী, মধ্যপন্থীদলের লোকেরাও সেরূপ দোষী, কেননা, এরূপ ব্যাপার উভয় দলেই ঘটিয়াছে; এবং জাতীয় একটা আন্দোলন ও বিপ্লবের সময় এরূপ আতিশয্য, অসঙ্গতি ও উগ্রতা স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে, ইহাও বলিতে হইবে যে, মধ্যপন্থিদলের মধ্যেও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণকামী ও স্বদেশোদ্ধার কার্য্যে নীরবে যথেষ্ট সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন ; যাঁহারা জ্ঞানে, অকৃত্রিম-স্বদেশানুরাগে, স্বদেশের কল্যাণার্থ আত্মত্যাগে অনেক চরম-

পন্থীদের শীর্ষস্থানীয়। শুধু কোনও কোনও অবাস্তব বিষয়ে মতভেদের জন্য ইঁহাদিগকে অবহেলা করা চরমপন্থিদের কোনও ক্রমেই বিধেয় নয়। মধ্যপন্থিদিগের মধ্যে অনেকে যেমন চরমপন্থিদের কার্য্যপ্রণালীর শুধু নূতনত্ব দেখিয়াই ইঁহাদের প্রতি অনুদারতা প্রকাশ করেন, নূতন পন্থাবলম্বীদের মধ্যেও অনেকে আবার মধ্যপন্থী নাম শুনিয়াই রুষ্ট হইয়া বসেন এবং তাঁহাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য সচেষ্ট হয়েন। দুঃখের বিষয়, ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, আমাদের মধ্যে যাহা কিছু সত্য ও সঙ্গত, তাহা অন্যকে শিখাইবার জন্য বিশেষভাবে প্রয়াস বা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন হয় না। মহামতি ইমার্সন বলিয়াছেন :—That which we are, we shall teach not voluntarily, but involuntarily"। বলা বাহুল্য যে, উভয় দলের মধ্যে এরূপ অযথা বিসম্বাদ ও অসদ্ভাব, অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক স্বদেশপ্রীতির অভাব জ্ঞাপক এবং এরূপ ভাবের বৃদ্ধি ও প্রসারে আমাদের এই ব্রতের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ম্লান হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনগ্রন্থি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যাইবে এবং জাতীয় বিনাশ-সংঘটনের সম্ভাবনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যদি বিপিন বাবুর মত অপরদলের গুণগ্রাহিতা চরমপন্থিদলে এবং গুরুদাস বাবুর মত উদারতা মধ্যপন্থিদলে একটু বিস্তারিত আকারে পরিলক্ষিত ও অনুকৃত হইত, তাহা হইলে, আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলন বাস্তবতা, শক্তিশীলতা ও ব্যাপকতায় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত।

বড় দুঃখের বিষয় যে,এই দুই দলের মধ্যে কয়েকটী বিষয়ে মতভেদ থাকায় আমাদের মধ্যে কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়, জাতীয় মহাসমিতির বিনাশ। বহুকাল হইতে যে দেশে এই মহাসমিতি জাতীয় শক্তি ও জাতীয় অনুপ্রাণনা-লাভের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা শত্রুমিত্র সকলকেই কিছু পরিমাণে স্বীকার করিতে হইবে, ইহার উচ্ছেদ-সাধনে যে আমাদের কোনও প্রকার জাতীয় ক্ষতি হয় নাই বা হইবে না, তাহা এখনও বলিবার যো নাই। কংগ্রেসের মধ্যপন্থা পাণ্ডারা চরমপন্থিদের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া ও তাহাদের দাবী উপেক্ষা করিয়া জাতীয়-যজ্ঞে একছত্র প্রভুত্ব লাভ করিবার জন্য একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন ; অপরদিকে দুর্দ্দমনীয় চরমপন্থি-নেতারাও সর্ব্ব প্রকারের বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া জাতীয় রথের সারথিত্ব লাভ করিবার জন্য তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন ; ইহারই ফলে জাতীয় যজ্ঞ পণ্ড হইল, অনেক অকপট স্বদেশ-সেবীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল এবং যে সকল উদারহৃদয় বিদেশীরেরা কংগ্রেসের মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয়-বিকাশ ইতিহাস দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ঘোর বিষাদের ছায়া পড়িল। এইরূপ বাদ, বিসম্বাদ ও সংঘর্ষ অনেক সময়েই বিভিন্ন মত ও প্রণালী অনুসরণের অপরিহার্য্য ফল বটে এবং অনেক সময় উহাদ্বারা উভয় পক্ষীয়েরই চিন্তা ও ভাবপ্রণালী সুস্পষ্টতর এবং কার্য্য ও উদ্যমের প্রবাহ ক্ষিপ্রতর হইয়া থাকে বটে, * কিন্তু

* বিখ্যাত পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার একখানি গ্রন্থে দুইটী রাজনৈতিক দলের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"In politics, again, it is almost a commonplace, that a party of order or stability, and a party of progress or reform, are both necessary elements of a healthy state of political life, until the one or the other shall have so enlarged its mental grasp as to be a par-

আমাদের মন প্রাণ যদি কেবল আত্মমত-সমর্থন ও বিরোধ বিসম্বাদ সমুত্থাপন কার্য্যেই নিযুক্ত ও পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে সহজেই আমাদের উদ্দেশ্য-বিস্মৃতি ও কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিবে এবং আমাদের পরস্পরের কার্য্যে জাতীয় জীবনের শক্তির সমূহ ক্ষয় হইবে। আমাদের মতভেদ যাহাই হউক না কেন, আমাদের সকলকেই অতি গভীরভাবে প্রণিধান করিতে হইবে যে, আমাদের সকলেরই অবস্থা অতিশয় শঙ্কটাপন্ন এবং আমাদের সকলকেই এই ঘোর সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আপ্রাণ যত্ন করিতে হইবে। অন্যান্য বিষয়ে আমাদের যাহারই যাহা মত ও বিশ্বাস হউক না কেন, এই দুই প্রধান বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। সুতরাং নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের মত বৈগুণ্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের এই সাধারণ কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে। আমাদের যেন স্মরণ থাকে, এ সময় অপ্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া বাদ বিসম্বাদ করিলে আমরা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইব। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া একটা গল্প মনে পড়িল। একবার একটী বৃহৎ নদীবক্ষে একটী নৌকাযোগে দুইটী ভিন্নস্থানের কয়েকজন অধিবাসী ভ্রমণ করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখা গেল যে, নৌকার গাত্রে একটী ছিদ্র দিয়া খুব জল প্রবেশ করিতেছে এবং এই কারণে নৌকাখানি জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। নৌকার সকল আরোহীই সম্মুখীন বিপদ দেখিতে পাইলেন এবং নৌকার জলগুলি কিছু কিছু করিয়া বাহির করিয়া দিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলেন। এমন সময়ে যাত্রীদের মধ্যে একজন একটু দর্পের সহিত বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহাদের দেশের লোকেরা যেমন বুদ্ধি ও বল সম্পন্ন, তেমন আর কেহই নয়। অপর দলের মধ্যে একজন লোক ইহাতে বিশেষরূপ আপত্তি প্রকাশ করিলেন এবং তিনিও খুব তেজের সহিত তাঁহাদের দেশের লোকের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার মহত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রোৎসাহিত হইলেন। এইরূপে ক্রমশঃ দুই দলের মধ্যে তর্ক বিতর্ক খুব চলিতে লাগিল এবং অবশেষে দুই দলের মধ্যে তুমুল মারামারি বাধিয়া গেল। এদিকে নৌকার জলও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং পরিশেষে অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় সকলকেই প্রাণ হারাইতে হইল। আমাদের দেশের রাজনৈতিকদের অযথা বাক্‌বিতণ্ডা দেখিয়া মনে হয়, ইঁহারা যেন এইরূপে দেশের নৌকা না ডুবান। অসংখ্য প্রকার মতভেদ লইয়াও খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর অগণ্য শাখা প্রশাখা গুলি অনেক দেশহিতকর ব্যাপারে একযোগে দাঁড়াইতেছে ও কার্য্য করিতেছে; আর আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি অতি সামান্য ও অবান্তর বিষয়ে ভিন্নমত লইয়া একই মহৎ উদ্দেশ্যসাধনার্থে একত্রও যুক্ত হইতে পারিবে না, ইহা অপেক্ষা অসঙ্গত ও অসম্ভব কথা কিছুই নাই। তাই বলি :—

ty equally of order and of progress, knowing and distinguishing what is fit to be pre-served from what ought to be swept away. Each of these modes of thinking derives its utility from the deficiencies of the other, but it is in a great measure the opposition of the other that keeps each within the limits of reason and sanity. * * * Truth, in the great practical concerns of life, is so much a question of the reconciling and combining of opposites that very few have minds sufficiently capacious and impartial to make the adjustment with an approach to correctness and it has to be made by the rough progress of a struggle between combatants fighting under hostile banners."

ধীর-চরমপন্থী হও একপ্রাণ,
উভয়েরই তো এক জন্মস্থান,
উভয়েরই তো এক ভগবান,
উভয়েরই তো এক গম্যস্থান,
উভয়ে মিলিয়া হও আগুয়ান,
উভের হিতে উভে কর আত্মদান।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

"পথ ও পাথেয়" এবং "সমস্যা।"

এই নামে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় ভাষায় যে দুটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ দুটী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি, "ধৈর্য্য" রক্ষণ করিয়া 'শ্রদ্ধার' সাহত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি নহেন, তিনি মনীষী; তাই তাঁহার রচনা আমি চিরদিনই শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া থাকি। বর্ত্তমান প্রবন্ধ দুটীও তদ্রূপই পড়িয়াছি, কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। যেরূপ বুঝিয়াছি, প্রথমতঃ তাহা বিবৃত করিব, পরে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। ঐ প্রবন্ধ পাঠে মনে যাহা উদয় হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। তাহা হইতে যদি কোন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার মীমাংসা তিনিই করিবেন, আমি করিব না।

আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে "পথ ও পাথেয়" সম্বন্ধে এই কয়েকটী বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১) "অন্য দেশে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশ", ভারতবর্ষেই তাহার পূর্ণ বিকাশ হইবে।

(২) "আদি কাল হইতে জগতে যত গুলি বড় বড় শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সকলগুলিরই কোন না কোন বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।" হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল শক্তিই এখানে মিলিত, ইহাদিগের মিলন হইতে ভবিষ্যতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে।

(৩) ঐ সকল শক্তির "সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের" মধ্য হইতে "মুক্তির উদার নির্ম্মল জ্যোতি বিকীর্ণ" হইবে।

(৪) তাই ইংরাজ "গবর্ণমেণ্টের শাসন নীতি যে পন্থাই অবলম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনি মথিত করিতে থাক্, আমাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।" অর্থাৎ ইংরাজ যাহা ইচ্ছা তাহা করুক, আমরা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের আশায় অপেক্ষা করিব।

(৫) হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, "এত জাতি, এত ধর্ম্ম, এত শক্তি" ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য "কোন তীর্থস্থানেই একত্র হয় নাই। একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই।" সুতরাং ভগবানের এই সুস্পষ্ট আদেশ অনুসারে এই সকল বিভিন্ন

জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন শক্তির সমন্বয় করিতেই আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। কাহাকেও বর্জ্জন করা উচিত নহে।

(৬) "ভারতবর্ষে এত জাতি বিভাগসত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব।" "ভেদলক্ষণই ত চারিদিকে। নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল, তখন কোন মতেই আমরা নিজের কর্ত্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না। তাহা যখন পারিব না, তখন অন্যে আমাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেই—কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না।" সুতরাং অকারণ গণ্ডগোল করা নিষ্প্রয়োজন।

(৭) আর যদি নিতান্তই গণ্ডগোল করি, তবে এখন ত করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। কারণ আমাদিগের কোন সম্বলই নাই। অগ্রে সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত করিয়া তাহার পর গণ্ডগোল ( ) করিতে হয়। প্রদীপ জ্বালিবার উদাহরণ দিয়া এই তথ্য বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অগ্রে "তাহার আধার গড়িতে হয়, সলিতা পাকাইতে হয়"... ইত্যাদি।

(৮) উপকরণ সংগ্রহের পূর্ব্বে গণ্ডগোল করিয়া দেশের লোককে মাতাইয়া তোলা অসঙ্গত। বৃথা উত্তেজনায় লোককে মাতাইয়া তুলিলে যে বিদ্বেষবুদ্ধি জাগ্রত হইবে, সেই "রক্তপিপাসু বিদ্বেষ-বুদ্ধির দ্বারা স্বরাজ লাভ হইলেও আমরা পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত" করিব। স্বরাজ রাখিতে পারিব না।

(৯) পরাধীনতা জিনিষটা মাথার বোঝার মত নয় যে, কোন প্রকারে ফেলিয়া দিলেই আমরা হাল্কা হইব। "অত সহজ নহে।" অর্থাৎ ফেলিয়া দেওয়া সহজ নহে। সুতরাং বৃথা স্বাধীনতার ভাব দেশমধ্যে জাগাইয়া তোলাটা এক প্রকার মত্ততা মাত্র। ভাবের এইরূপ মত্ততায় কোন কাজ হয় না। যাহারা মনে করে, ভাব বিস্তার হইলেই উপযোগী কার্য্যও হইবে, তাহারা বৃথাই লোককে "মাতাল" করিয়া তুলে। ইহাতে কেবল বিদ্বেষই জন্মিবে, আর কোন ফল নাই।

(১০) বিদ্বেষ জন্মিলেই একটা পথ বাহির হইবে, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ফল যখন বিপজ্জনক, অথচ অনিশ্চিত এবং দেশটা যখন 'অনেকের" একার নহে, তখন এরূপ অনিশ্চিত বিপদের পথে দেশকে লইতে কাহারও অধিকার নাই।

(১১) "যে সমস্ত বিচিত্র উপকরণ কালকালান্তর ও দেশ দেশান্তর হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না।" এদিকে আমাদিগের মধ্যে যত প্রকার ভেদ রহিয়াছে, তাহাতে ঐ "ক্ষুদ্র" শক্তিকে বৃহৎ করিবারও উপায় নাই। আর উপায় থাকিলেও যে সকল জাতি, যে সকল শক্তি এতদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করা অনুচিত, কারণ তদ্রূপ চেষ্টায় ঐ সকল জাতি ও শক্তি একত্রিত হইয়া ভবিষ্যতে পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠিত হইবার যে "সুস্পষ্ট আদেশ" পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠিত করিতে নিভৃতে তপস্যা করা উচিত। "তাহা নিশ্চয়ই কেহ করিতেছে।" গোলমালে তাহার তপস্যা ভঙ্গ হইতে পারে, আর কোন লাভ হইবে না।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হইতে আমি

যাহা বুঝিয়াছি, তাহা উপরে বিবৃত করিলাম। আমি অনেকস্থলে তাঁহার ভাষাই উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। বোধ হয় কদর্থ গ্রহণ করি নাই, অন্ততঃ জ্ঞাতসারে করি নাই, ইহা নিশ্চয়। প্রবন্ধে আরও অনেক কথা আছে কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া যাহা আমার বোধ হইয়াছে, তাহাই উপরের এগার দফাতে প্রকাশ করিলাম। উহাকে আরও সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। তাহারও চেষ্টা করিব। প্রবন্ধের মূল কথা বোধ হয় এই :—

আমরা বিচ্ছিন্ন, আমরা ক্ষুদ্র, আমরা কিছুই করিতে পারিব না। এমত অবস্থায় স্বরাজের ভাবে বর্ত্তমান সময়ে দেশকে মাতাইয়া তোলা মত্ততা মাত্র। উহাতে ইংরাজের প্রতি কেবল বিদ্বেষ ভাবই জাগিয়া উঠে, আর কিছুই হয় না। কিন্তু বিদ্বেষভাব জাগাইয়া তোলা অকর্ত্তব্য। কারণ ভগবান যখন কালকালান্তর, দেশদেশান্তর হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম ও শক্তিকে এতদ্দেশে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তখন তাহাদিগকে মিলিত ও একত্রিত করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠিত করাই তাঁহার অভিপ্রেত। এই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগের বৃথা গণ্ডগোল করা উচিত নহে। স্বরাজ লইয়া আন্দোলন করিলে দেশের লোক ভাবে মত্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইতে কর্ম্ম হইবে না। পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠিত করাই লক্ষ্য; আর সেই উদ্দেশ্যে কোথাও "নিশ্চয়ই আমাদের দেশে কল্যাণময় চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করিতেছে।" এরূপ অবস্থায় স্বরাজভাবের মত্ততা লইয়া গোলযোগ করিলে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হইতে পারে।

ইহাই যদি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধের আসল কথা হয়, তবে প্রথমেই এই মনে হয় যে, যে জাতি পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং যাহার দেশে বিভিন্ন বিজেতৃগণ পুঁটাগাড়ি করিয়া বসে নাই, তাহার মত দুর্ভাগ্যবান কেহই নহে। কারণ সে কদাচ "মুক্তির উদার নির্ম্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ" করিতে পারিবে না। সে জাতি পুনঃ পুনঃ অপরাপর জাতি কর্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে তাড়াইতে পারে নাই, সে বড়ই ভাগ্যধর; কারণ সে-ই পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী, এবং তাহার দেশই পরম পবিত্র তীর্থস্থান। পুনঃ পুনঃ পরাজিত জাতির ইহা অপেক্ষা সুখের সংবাদ আর কি আছে? কিন্তু তাহাতেও একটু গোল বাধিয়া যাইতেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, সকলকেই একত্রে মিলিত করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব একই দেশেই গঠিত করা যখন ভগবানের আদেশ, আর বৌদ্ধ যখন এদেশে একরূপ নাই বলিলেই হয়, তখন জাপানী কিম্বা চীনাদিগকে আনিবার চেষ্টা করা বৈধ কি না? কিন্তু চেষ্টা করিবই বা কেমন করিয়া? ডাকামাত্র তাহারাও আসিবে না, খ্রীষ্টানেরাও তাহাদিগকে সহজে স্থান দিবেন না। আর খ্রীষ্টান-বিদ্বেষ না জন্মিলেই বা সকলে বৌদ্ধদিগকে ডাকিবে কেন? কিন্তু এ পথও যখন বিপজ্জনক, তখন সকলের মত ভিন্ন এ পথ অবলম্বিত হইতেই পারে না। একার ত দেশ নহে; সুতরাং সকলের মত না হইলেও হয় না; কিন্তু সকলের মত পাইব কেমন করিয়া? এস্থলে রবীন্দ্রনাথ আর একটী কথা বলিয়াছিলেন। "সংশয়াপন্ন ব্যবস্থা" বুঝিয়া"

অনুষ্ঠান করিবার কাহারও অধিকার নাই, অর্থাৎ চরম লক্ষ্য বিবেচনা পূর্ব্বক নিশ্চয় রূপে স্থির না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। একথা আপাততঃ সত্য বলিয়া বোধ হইলেও, ইহা মানব-চরিত্রের প্রকৃতিগত নহে। বিবেচনা বুদ্ধি দ্বারা মানব সমাজের গুরুতর কার্য্য সকল অল্পই সাধিত হইয়া থাকে।* ভাব কর্ম্মকে প্রবর্ত্তন করিবে, বুদ্ধি উপায় উদ্ভাবন করতঃ তাহাকে সফলতা প্রদান করিবে, ইহাই মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। ইহাকে বিস্মৃত হইয়া বুদ্ধির প্রতি অনুষ্ঠানের ভার দিলে 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি' প্রবচনেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে, আর কিছুই হইবে না।" "সংশয়াপন্ন ব্যবস্থা" লইয়াই কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা নিশ্চয় মৃত্যু।†

রবীন্দ্রনাথ কবি এবং মনীষী। তিনি দূরদৃষ্টিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্টানের যে প্রেমের সম্মিলন দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এ সম্মিলন কিরূপ, তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। ইহা কি "যান্ত্রিক" না "জৈবিক"? এই দুইটী শব্দ তাঁহার নিজের, আমার নহে। মানুষের দুইটী পদার্থই সম্বল, দুই ভিন্ন তিন নাই। সেই দুইটী—দেহ ও মন। ভগবানের আদেশ যে সম্মিলন, তাহা কি দেহের না মনের? দেহের হইলে ত যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতে হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্টান কি এইরূপ সম্বন্ধে মিলিত হইতে স্বীকার করিবে? অবশ্য, ভগবানের আদেশ থাকিলে স্বীকার করিতেই হইবে। এ হিসাবে দেখিতে গেলে, যে সকল হিন্দু কি মুসলমান মেম বিবাহ করিতেছেন, তাঁহারা ভগবানের আদেশ মতই কার্য্য করিতেছেন, সন্দেহ নাই। এই পক্ষেই যদি যত্নবান হওয়া উচিত হয়, তাহাতেও সকলের মত লওয়া আবশ্যক হইতেছে না কি? আর যদি মনের মিলনই ভগবানের আদেশ হয়, তবে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্মী সকলে একমন হইবার আদেশ মন্দ বোধ হয় না। তাহা হইলে সকল বিরোধ চলিয়া গিয়া ধরাতলে এক বিরাট শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা হইতে মহান্ ভাব আর কি হইতে পারে? এই বিরাট শান্তি, সাম্য ও মৈত্রীকে অপেক্ষা করে। সুতরাং ইহাই প্রেমের রাজ্য। এই মিলননিয়ম্ যে কতদূরে আছে, তাহা আমিত কল্পনাই করিতে পারিব না। "শনৈঃ শনৈঃ" যাইতে সম্মত আছি, কিন্তু অনন্ত কালেও পথ ফুরাইবে ত? এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এক জাতি প্রভু, আর এক জাতি ভৃত্য, এক জাতি শাস্তা, আর এক জাতি শাসিত, এইরূপ স্থলে প্রকৃত মৈত্রী, প্রকৃত মিলন হইতে পারে কিনা? অবশ্য ভগবানের আদেশে সবই হইতে পারে। কিন্তু আমরা মবচক্ষুতে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে ঐরূপ স্থলে প্রকৃত মিলনের আশা করা যায় কি না? এ প্রশ্নের উত্তর পাঠকগণ নিজেরাই দিবেন। তারপর আর এক কথা। অধীনতা পদার্থটাই যে মহা অবসাদক, ইহাতে জাতীয় বিলোপ হইবেই, দেহ ও মন অবসন্ন হইতে হইতে শেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইবেই। মানুষের বিষয় বলিতে হইলে,

* Human nature is such that we rarely find our way through the pure light of reason.

Herbert Spencer Lecture 1907 p 24

† He that will not stir till he infallibly knows the business he goes about will have little else to do but to sit still and perish. Human understanding IV 14. para I.

মানব তত্ত্বজ্ঞগণের মত আদরণীয় বলিয়া বোধ করি। তাহারা ও প্রায় এক বাক্যেই বলেন যে, অধীনতার উপর শিক্ষার অভি-সম্পাত আছে * ইহাতে প্রভু ও ভৃত্য উভয়কেই অবনতিতে ফেলিয়া দেয়। সুতরাং কোন জাতি অপর জাতির অধীন হউক অথবা থাকুক, ইহা ত ভগবানের অভিপ্রেত হইতে পারে না। কারণ অধীনতা হইতে জাতীয় বিলোপ আসিবেই। মহাশান্তির রাজ্য, বিরাট প্রেমের রাজ্য ধরাতলে প্রতি-ষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বেই অধীন জাতি নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, তাহার কি? এ স্থলে দড়ির বন্ধনের অধীনে থাকিয়া দুইটী ডালের মিলনের উদাহরণ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এ বিষয় আমি "পরবশতা" নামক প্রবন্ধে"নব্যভারতে" অতি অল্প দিন হইল বিস্তৃত রূপ আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ণ মনুষ্যত্বের অপেক্ষায় থাকিতে হইলে এত কালের মধ্যে প্লীহা ফাটিয়াই যে পঞ্চত্ব পাইব। রবীন্দ্রনাথের উপদেশ এই যে "গবর্ণমেণ্টের শাসননীতি যে পন্থাই অবলম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ব্যক্তিগত ব্যবহার যেরূপই হউক, আমরা "আত্মবিস্মৃত" হইব না। এই উপ-দেশ পালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে করি, কারণ আমার প্লীহা কেন, হাড়েও অত সহ্য হইবে না। আমার পঞ্চত্ব তৎক্ষণাৎ। জিজ্ঞাসা করি, জাব যে নিম্ন হইতে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করি-য়াছে, ইহা কি এই উপায়ে সাধিত হই-য়াছে?

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের শেষ উপদেশে অতীব শান্তিময়। শুধু ভাব চাই না, উহা মত্ততা মাত্র। কাজ না হইলে ভাব দিয়া কি করিব? কিন্তু ভাব না জাগিলেও যে এ শ্রেণীর কাজ হয় না। হৃৎপিণ্ড ধক্ ধক্ করে, নাড়ী টক্ টক্ করে; ভাব না জাগি-লেও এ সব কাজ হয়। কিন্তু আর যে কিছুই হয় না, তাহার উপায় কি? ভাব না হইলে কাজ আসিবে না, অথচ কাজ না আসিলেও শুধু ভাবকে চাই না; এ যে বিষম সমস্যা। এস্থলে নীরব নিশ্চল থাকা ব্যতীত আর উপায় কি? এ একরূপ গভীর শান্তি, সন্দেহ নাই। সেই বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ Francis Galton, যিনি বৃদ্ধবয়সেও মানবের উন্নতির জন্য Eugenics নামক জীবতত্ত্বের সারভূত শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং যুবার অধিক অধ্যবসায়ের সহিত তাহার আলোচনা করিতেছেন, তিনি কি বলেন, শুনিতে ইচ্ছা হয়। তিনি বলেন, জনসাধা-রণের মধ্যে ভাব সম্যক প্রকারে জাগ্রত হইলে কর্ম্ম হইবেই। * জানি না, রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদিগের কথা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন কি না। কিন্তু ভাব বিস্তারের আব-শ্যকতা অস্বীকার করিলে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত করিতে পারিবেন, ইহাত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। আমরা "বিচ্ছিন্ন", এই নিমিত্ত "অন্যে আমাদিগের উপর কর্তৃত্ব করিবেই—কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না"—এই নৈরা-শ্যই কর্ম্মের প্রধান প্রতিরোধক। আপনার উপর যাহার বিশ্বাস নাই, সে জগতে কিছুই করিতে পারিবে না, সে চিরদিন পরপদানত থাকিবেই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল সহিষ্ণুতার দ্বারা পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠিত হয় না; অন্ততঃ পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা একান্ত অসম্ভব।

* Weisman's Heredity, Vol II, p 27

* Herbert Spencer Lecture 1907 p 29.

"পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে উপকরণ সংগ্রহের একটা কথা আছে। ভাব বিস্তার না হইলে তাহাই বা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? প্রদীপ জ্বালিবার একটা ভাব না হইলেত প্রদীপজ্বালার উপকরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না! আর "অনেকের" মত লইয়াও কি কখন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? দেশব্যাপী কর্ম্ম দেশের সকলের সহিত কিম্বা অনেকের সহিত পরামর্শ করিয়া হয় না। যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো-জনঃ *। শ্রেষ্ঠ যেরূপ আচরণ করেন, ইতর জনেও তদ্রূপ করে। ইহারই নাম দৃষ্টান্ত। কোন সমাজে কোন কর্ম্মই অনেকে মিলিত হইয়া অনুষ্ঠান করে না। অল্পের দৃষ্টান্ত অনেকে অনুসরণ করে, ইহাই নিয়ম। এ নিয়মের অন্যথায় কিছুই হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, তিনি "দণ্ডশালার দ্বারে বসিয়া" আছেন, সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় চাঞ্চল্য ও ভীতির মধ্যে সত্য রক্ষা করা কঠিন। এ কথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধকে নিশ্চয়ই গভীর চিন্তার ফল ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। তথাপিও আমার মনে হয় যে, চিন্তা অপেক্ষা ভাবের এবং কল্পনার খেলাই আলোচ্য প্রবন্ধে অধিকতর পরিস্ফুট। সকল জাতির প্রেম-সম্মিলন ও পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ—একটা প্রকাণ্ড কল্পনা। ইহারই অপেক্ষা করিয়া নীরব নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকাই কি পরম পুরুষার্থ? পূর্ণ মনুষ্যত্বের অপেক্ষা যেন করিলাম; সে কথা না হয় মানিয়াই লইলাম, কিন্তু তৎপক্ষে অপেক্ষা করা ভিন্ন আর কোন কর্ম্ম আছে কি? কি করিব? উহার প্রত্যাশায় আমাদিগের অনুষ্ঠেয় কি? রবীন্দ্রনাথ এ সকল কথার কোনই স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যেন নীরবে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বের অপেক্ষা করাই আমাদিগের কাজ; স্বরাজ লইয়া আন্দোলন করতঃ বৃথা মত্ততা উৎপাদন করা নিতান্ত অনুচিত।

* গীতা। ৩।২১।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, আমি উহা পাঠ করিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে না পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি এতদ্দেশে বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান প্রবর্ত্তক; অথচ প্রবন্ধ মধ্যে তাহার নিজের চিরন্তন উপদেশেরই বিপরীত ভাব লক্ষিত হয়; ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান সময়ে রাজা প্রজার মধ্যে যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা শোচনীয়, সন্দেহ নাই। আর সম্প্রতি যে লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহাও অতীব ক্লেশকর। সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু এতদ্দেশীয়গণ "স্বাধীনতার দোহাই দিয়া "অপরের" মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া বলপূর্ব্বক একাকার করিয়া" দিতেছে, এই কথা রবীন্দ্রনাথের মুখ হইতে শুনিতে হইল, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর নাই। বয়কট ব্যাপারে যে যুবকগণ দণ্ডিত হইয়াছে, ইহারাই কি বল প্রয়োগ অপরাধে দোষী? ইহারা কোথায় কাহার উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে? ইহারা হাতে পায়ে ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। তাহারই নাম কি বল প্রয়োগ? ইংলিসম্যান, পাইওনিয়ারের মুখে এ কথা শুনিয়াছি; তাহাতে দুঃখিত হই নাই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হই-

লাম। তার পর বয়কট ব্যাপারে যুবকগণ যদি নৈতিক বল প্রয়োগ করিয়াই থাকে,—দৈহিক বল প্রয়োগ ত করেই নাই,—তাহাই কি দূষণীয়? কোন্ দেশে শ্রেষ্ঠগণ জনসাধারণের হিতের জন্য এরূপ বল প্রয়োগ করেন না? রাজবিধি দ্বারা বাধ্য করিয়া, অভিভাবকদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা, ঐরূপে বাধ্য করিয়া জনসাধারণকে সৈনিকদল-ভুক্ত করা,—এ সকল কি এক প্রকার বল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত নহে? ইহার অধিক আমাদিগের যুবকগণ আর কি করিয়াছে? সকলকে বুঝাইয়া কখনই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। বরং প্রথমতঃ সকলে ঈপ্সিত ভাবে প্রবুদ্ধ না হইলে একটু চাপ দেওয়াও বিধিসঙ্গত *। একাগ্র এবং উদ্যোগী ব্যক্তিই কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। বিজ্ঞতা তাহার পরিচালনা করিবে। তাহার পর,—ফল ভগবানের হস্তে। ফল সকল সময়েই যে সু হইবে, কু হইবেই না, এরূপ আশা করা অসঙ্গত। সময়ে অকৃতকার্য্য হওয়া অতীব সম্ভব। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অনেক স্থলেই অকৃতকার্য্যতার মধ্য দিয়াই সফলতা লাভ করিতে হয়। অকৃতকার্য্যতা বৃথা হয় না, বরং উহাই সফলতার জনক।

সর্ব্বজাতির মহাসম্মিলন বিধাতার আদেশ হইতে পারে, কিন্তু উহা সকলের শুনিতে বিলম্ব আছে। যে পর্য্যন্ত সকলে ঐ আদেশ প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত গভীর নিশ্চেষ্টতা, একান্ত সহিষ্ণুতাই আমাদিগের অবলম্বনীয়; পথ ও পাথেয় কি এই শিক্ষা দিতেছে? গবর্ণমেণ্ট এবং ইংরাজেরা আমাদিগের চিত্তকে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া মথিত করুক, আমরা মহাসিলন স্মরণ করিব, কখনই "আত্মবিস্মৃত" হইব না, এই মহা শিক্ষা দিবার নিমিত্তই কি পথ ও পাথেয়ের অবতারণা? আমরা চিরপদানত থাকিব, অন্যে আমাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবে, "আমরা কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না" ইহাই কি মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের প্রবীণ মত? আমি যদি আলোচ্য প্রবন্ধ ঠিক বুঝিয়া থাকি, তবে কপালে করাঘাত করত, নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

"সমস্যা।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ "পথ ও পাথেয়"নামক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় আরও বিশদ করিবার নিমিত্ত "সমস্যা" নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে ও অন্যান্য কাগজে একই সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন। উপরে পূর্ব্ব প্রবন্ধটী বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, এক্ষণে "সমস্যা"ও বুঝিবার চেষ্টা করিব।

'পথ ও পাথেয়" রচনার উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা"সমস্যা"আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে দেশহিত ব্যাপারটা কি? * * * দ্বিতীয়তঃ সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া?—এই দুইটী কার্য্যই বুঝাইয়া দেওয়া রবীন্দ্র নাথের উদ্দেশ্য ছিল। "পথ ও পাথেয়ের" আলোচ্য এই দুইটী কথাই ছিল,তাহা এক্ষণে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রবন্ধের ন্যায় এ প্রবন্ধও বলিতেছে যে, "পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায়, স্বভাবে আচ-

---

* Public opinion may however be easily directed into different channels by oppoitune pressure. Herbert Spencer Lecture 1907, p 26.

রূপে, ধর্ম্মে বিচিত্র—* * * সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গী করিয়া দেখিব;" ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য, ইহাই প্রকৃত হিতসাধন। এ প্রবন্ধে "পূর্ণ মনুষ্যত্ব" কথাটা নাই; কিন্তু "একাঙ্গত্বই" বোধ হয় "পূর্ণমনুষ্যত্ব" হইবে। এই হইল হিতসাধন। আর তাহার উপায় হইল, "সকল সন্দেহকে দূর করা" "সকল বিদ্বেষকে পরাস্ত করা," "মানবের প্রতি সর্ব্বসহিষ্ণু পরম প্রেম" করা, এবং 'সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি"। সকল মানুষকে একাঙ্গ করা, পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাহাই হউক, কিন্তু উপায়গুলি যে লেখকের উচ্চ হৃদয়ের, মহান্ উদার ভাবের পরিচয় দিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাব উদার হইলেও, ফল কর্ম্ম জগতের অতীত। কারণ, "সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উপায় উপলব্ধি হইলেই সে সকল কর্ম্ম ফুরাইয়া যায়, জীবের কর্ম্ম-বন্ধন মোচন হয়, মানব মুক্ত হইয়া যায়,—তাহার কি? উপনিষদাদি বেদান্ত শাস্ত্রে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে সে "সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি" হইলেই জীব মুক্ত হয়—সুতরাং উপায় কি করা যাইতে পারে? "একাঙ্গ" হইলেই যে মুস্কিল! আর "মহাজাতি" গঠন করিয়া হইবে কি? কর্ম্মই যে আর থাকিল না! চিরশান্তিময় বিশ্বব্যাপ্ত প্রেমের রাজ্য স্থাপিত হইলে ত সকল গোল চুকিয়াই গেল। মানব আর মানবই রহিল না। কিন্তু মানবকে কর্ম্ম জগতের মহা সংঘর্ষণের মধ্যে রাখিয়া, মিলেনিয়ম্ আসিবার পূর্ব্বে, আমাদিগের ন্যায় দগ্ধকপাল, পরবিজিত জাতির কি উপায় হইতে পারে,এই সমস্যাই আলোচনার বিষয়। রবীন্দ্র বাবু তাহা হইতে অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। আমরা নীচের দিক হইতে তাঁহার কথাগুলি বুঝিতে পারিব কি? যদি পারি, একবার তাহারই চেষ্টা করিব।

কিন্তু সে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের একটী উপদেশ স্মরণ করা আবশ্যক। এই উপদেশটী দুই প্রবন্ধের মধ্য হইতেই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা "বিচ্ছিন্ন, কোন দিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিব না।""যে দেশে একটী মহাজাতি বাঁধিয়া উঠে নাই, সেদেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না।" তাঁহার মতে মহাজাতি বাঁধিয়া উঠাইবার উপায় হইতেছে, সকল বিচিত্রকে একাঙ্গ করা, সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উপলব্ধি করা। সুতরাং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে মহাজাতিও বাঁধিল না, মহাজাতি না বাঁধিলে স্বাধীনতাও আসিতে পারে না। কিন্তু এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও একদম্ নির্ব্বাণ মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর কিসের মহাজাতির বাঁধা? তখন আর কিসের "ইংরাজ তাড়ানো"? কিসের স্বাধীনতা? তবেই দেখা যাইতেছে, যে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের পূর্ব্বে আমাদের পরাধীনতা ঘুচিবার আর উপায় নাই, দুই কর্ম্ম এক সঙ্গেই হইতে হইবে। ইহার নাম আমি বুঝি—চিরদাসত্ব। এই আশার বাণী লইয়াই যদি রবীন্দ্রনাথ এই হতভাগ্য দেশের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তবে এদেশের সমগ্র নরনারীকে বিধাতা এখনই বধির করিয়া দিন, যেন এ বাণী তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে। জীবের ইতিহাসে একজাতি অপর জাতির অধীন হওয়া প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, এক বা একাধিক ব্যক্তি, অপর ব্যক্তির অধীন হইতে পারে, তাহার কর্ত্তৃক বিনষ্টও হইতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ পর্য্যন্ত

কোন জাতিই কখনও পরাধীনতা স্বীকার করে নাই। মানবও স্বেচ্ছায় ঐ অবস্থা গ্রহণ করে নাই, স্বেচ্ছায় ঐ অবস্থায় থাকিতেও চাহে না। বিভিন্ন জীব প্রত্যেকে স্বাধীন অবস্থাতেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কখন উন্নত কখন বা অবনত হইয়াছে। এই উন্নতি, অবনতির মধ্য দিয়াই জীব নিম্ন হইতে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। অবরোধ, গৃহপালিত অবস্থা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরের শাসন বহন,—এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিতেই পরাধীনতা অবসাদ আনিয়া উপস্থিত করে, তাহার পরিণাম ধ্বংস, বিলোপ। পরাধীন ও পরবশ, এ পরিণামের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেই পারে না। অধীনতা,প্রভু ও ভৃত্য, উভয়কেই অবসন্ন করিয়া ফেলে। মানব-সমাজ এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলে প্রভু হইতেও আর ইচ্ছা করিবে না। যেমন মানব দাসত্ব চাহে না, তেমনি প্রভুত্ব চাহিবে না। কিন্তু এ অবস্থা আসিবার বহু বিলম্ব, অন্তরায়ও অনেক। যাহা হউক, পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং প্রেমের রাজ্য আমিও যে বিশ্বাস করি না, তাহা নহে। আমি অন্য ভাবে বিশ্বাস করি। সে কথার উল্লেখ এস্থলে অনাবশ্যক। এস্থলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অর্থই উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছি। "সমস্যা" হইতে বুঝা যায় যে, বর্ণ, ভাষা, স্বভাব, আচরণ, ধর্ম্ম, এই সকলের বৈচিত্র্য বিলুপ্ত করিয়া একাতীত্ব প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার লক্ষ্য। বর্ণ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, উহা কি জাতি, না দেহের রং? ভারতের জাতিভেদ যে প্রকারের, তাহাকে বিলুপ্ত করা অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু গুণ-কর্ম্ম-ভেদে জাতিভেদ মানব সমাজ হইতে কেহই দূর করিতে পারিবেন না; উহা মানবের প্রকৃতিগত। আর দেহের রং জীববিজ্ঞানের বল বিক্রম ছাড়িয়া একপা-ও এদিক ওদিক যাইবে না। রং বংশগত, প্রধানতঃ এই কারণই রঙ্গের নিয়ামক,ইহা বর্ণোপকরণের * উপর নির্ভর করে। শঙ্কর জাতিরাও বংশানুক্রমে পিতা মাতার রং সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে না। পিতামাতার রং মিশ্রিত হইয়াও আবার কতিপয় অপত্যে পৃথক্ হইয়া দেখা দেয়; তখন ঐ সকল অপত্য ঠিক পিতা অথবা মাতার রং প্রাপ্ত হয়। মানব সমাজে এই নিয়ম সর্ব্বত্র প্রযোজ্য না হইলেও, ইহার প্রয়োগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং বর্ণ বলিতে জাতিই হউক, অথবা রং-ই হউক, বৈচিত্র্য ত গেল না, একাঙ্গত্ব প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ হইয়া উঠিল। প্রকৃতি ঠাকুরাণীর নিয়ম অস্বীকার করিবার মত জোর কাহারও নাই। উহা মানিয়াই উহার উপরে উঠিতে হয়। সুতরাং "একাঙ্গ" অথবা একাকার ত হইল না। ভাষাই বা কেমন করিয়া এক হইবে? বিভিন্ন জাতি একটা ভাষা অবলম্বনে পরস্পরের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে পারে; কিন্তু সকলের এক ভাষা হইতেই পারেনা। ভাষাভেদের কারণ সকল অতীত কালেও যে প্রণালীতে কার্য্য করিয়াছে, চিরদিনই ত তদ্রূপই করিবে। জোর করিয়া একাঙ্গ করিয়া দিলেও ভাষা আবার পৃথক হইয়া যাইবে। ভাষা মানব প্রকৃতিকে অনুসরণ করে; বিভিন্ন মানবের প্রকৃতিও, মিলেনিয়মের পূর্ব্বে, এক হইবে না; ভাষাও এক হইবে না। স্বভাব এবং আচরণ প্রায় এক কথাই; স্বভাব অনুসারেই

* Pigment.

আচরণ নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহাতে মানুষের চির বৈচিত্র্য এক হইবার কোন উপায়ই নাই। সুতরাং ধর্ম্মও যখন স্বভাবের অনুসরণ করে, তখন তাহাও চির বিচিত্র থাকিবেই। মানব অথবা ভারতীয় মানব সকলে এক ধর্ম্ম অবলম্বন করার কোন সম্ভব এখন পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে না। রবীন্দ্রবাবু সত্যই বলিয়াছেন "বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট।" বিচিত্র মানবের সমষ্টি লইয়াই বিরাট, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিচিত্র মানব যখন বিরাটে পরিণত হইবে, তখনত কর্ম্মজগত অন্তর্হিত হইবে, সকলই বিরাট পুরুষে লীন হইবে। সে সময়ের আলোচনা এস্থলে অনাবশ্যক। কিন্তু সে সময়ের পূর্ব্বে বৈচিত্র্য যে কিছুতেই যাইবার নহে। দেহ মন, এই দুই-ই মানবের সম্বল। ইহাদিগের একটীও যে বিচিত্র হইতে ভুলে না। যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বিবিধ জাতিকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া সমগ্র মানবকে, অথবা ভারতীয় সমস্ত জাতিকে এক মিশ্র জাতিতে পরিণত করা সম্ভব হইলেও, দেহ মন বিচিত্র থাকিয়াই যাইবে। পিতামাতার দেহ ও মন, অপত্য প্রাপ্ত হইবেই। এ বিধির লঙ্ঘন নাই। সুতরাং পূর্ণ মনুষ্যত্বের সম্ভাবনা এদিক দিয়া কিরূপে হইতে পারে? পরিবর্ত্তন যে বিধাতার নিয়ম, প্রভেদ যে জগতের অনিবার্য্য বিধি। "একাঙ্গ" করিব কেমন করিয়া? ভাব প্রভেদের মধ্যেও একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, যদি লক্ষ্য এক হয়, উদ্দেশ্য এক হয়। কোন একটী উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া হস্ত, পদ, মুখ ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ যেমন সমবেত চেষ্টা করিতে পারে, তেমনি, এক উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, নিগ্রো, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিও এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। উদ্দেশ্যের একতায়, আমরা বিচ্ছিন্ন হইলেও, সমবেত চেষ্টা করিতে অসমর্থ হইব না। আর বিচ্ছিন্ন শব্দে শ্রীযুত রবীন্দ্র বাবু কি বোধ করেন? ভারতীয় ত্রিশ কোটী বিচ্ছিন্ন থাকা পর্য্যন্ত মিলিতের নিকট পরাভূত হইবেই, ইহা কি তিনি বলিতে চাহেন? কেন, তিন কোটী অথবা তিন লক্ষও কি কোন কালেই একাঙ্গত্ব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে? যাহারা বর্ত্তমান যুগে স্বাধীন জাতি, তাহারা কি অগ্রে সকলেই একাঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, পরে স্বাধীন হইয়াছে? তাহারা কি সকলেই অগ্রে সমস্ত সন্দেহ জয় করিয়া, সমস্ত বিদ্বেষ পরাস্ত করিয়া, প্রেমের রাজ্য স্থাপিত করিয়া, সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি করিয়া, তাহার পর মহাজাতি গঠিত করিয়াছিল? তাহার পর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল? সকলেই ত একাঙ্গত্ব লাভের পূর্ব্বেই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। মহামতি গ্লাডষ্টোনের মহোপদেশ এস্থলে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। তিনি শিখাইয়াছেন যে, স্বাধীন না হইলে কোন জাতিই স্বাধীনতা লাভের যোগ্য হয় না। রবীন্দ্রনাথ কি ইহা অস্বীকার করেন! তিনি লিখিয়াছেন, "এমন তর্কও শুনা যায় যে, যতদিন আমরা পরের কড়া শাসনের অধীন হইয়া থাকিব, ততদিন আমরা জাত বাঁধিয়া তুলিতেই পারিব না। * * একথা যদি সত্য হয়, তবে এ সমস্যার কোন মীমাংসাই নাই।" এ লেখা হইতে ত ঐ মহোপদেশ তিনি স্বীকার করেন বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু কেবল রাজনীতিজ্ঞ নহে, বৈজ্ঞানিকগণও পরাধীনের অযোগ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। পরাধীন অযোগ্য থাকিবেই, কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া

পরাধীনতার অবসাদকে ঠেলিয়া ফেলিতে হয়। তখন, তৎপূর্ব্বে নহে, ক্রমে যোগ্যতা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে পরাধীন এক বিষয়ে অযোগ্য থাকে, সে অন্য বিষয়ে যোগ্য থাকিতে পারে। আর তাহাতেই তাহার শৃঙ্খল মোচন হইতে পারে। ইহা অতীব সম্ভব, সম্ভব না হইলে কোন পরাধীনই কখনও স্বাধীন হইতে পারিত না। অবশ্য, আমরা এখনই স্বাধীন হইব, এ কথা বলিলেই স্বাধীন হওয়া যায় না, তাহা বুঝি। কিন্তু তাই বলিয়া "এ সমস্যার শেষ মীমাংসাই নাই", "বিচ্ছিন্ন কোন দিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধে জয়লাভ করিতে পারিবে না" ইত্যাকার নৈরাশ্যজনক কথা কখনও স্বীকার করিতে পারি না! এ সকল কথা খণ্ডন করা কঠিন নয়। এ সকল রবীন্দ্র বাবু যেরূপ ভাবে বলিয়াছেন, তাহাতে অসত্যের সহিত সত্য এবং অর্দ্ধ সত্য জড়িত রহিয়াছে, এই নিমিত্তই ইহার প্রতিবাদ করা কঠিন। বিচ্ছিন্ন বাস্তবিকই ত মিলিতের সহিত বিরোধ করিতে পারে না। কিন্তু আমরা কি এই অর্থে বিচ্ছিন্ন? অথবা এই অর্থে কি চিরদিনই বিচ্ছিন্ন থাকিব? উদ্দেশ্যের একতায় আমাদিগের কোন বিশেষ অংশও কি মিলিত নহে? অথবা মিলিত হইতে পারে না? ফলতঃ চিরদাসত্ব কোন জাতিরই হইতে পারে না; চিরপ্রভুত্বও কাহারও ভাগ্যে নাই। ভাগ্য, চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা বিধাতারই নিয়ম। ইহাই পতিত জাতির আশা স্থল। এই আশা, এই ভাব বিস্তার করাই কর্ত্তব্য; ইহাকে উৎপাটিত করা, ইহাকে নির্ম্মূল করা কাহারও উচিত নহে। বৃদ্ধ মনীষী গ্ল্যাডষ্টনের সহিত আমাদিগেরও স্বীকার করা উচিত যে, "ভাব প্রবল হইলে কর্ম্ম হইবেই।"* 'স্ব' কর্ম্মায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগের স্বাধীনতার "স্ব"ই খুঁজিয়া পান নাই, অথচ কর্ম্মেই পরকেও আপন করা যাইতে পারে, ইহা তিনি স্বীকার করেন। "স্ব জিনিষটা" কর্ম্ম হইতেই পূর্ণতা লাভ করে। ভাবের ঐক্য হইতে উহার জন্ম, কর্ম্মে উহার পরিণতি।

বর্ত্তমান সময়ে এ সকল আলোচনায় সত্যকে লঙ্ঘন করিবার আশঙ্কা আছে, ইহা রবীন্দ্র বাবু পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছেন, তাহা ঠিক্। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক ঠিক হইতেছে, রবীন্দ্র বাবুর নিজের মতের সহিত নিজের অনৈক্য। কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা এরূপ ভাবে বুঝি নাই; প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিকেও আমরা এরূপ ভাবে বুঝি নাই। কি জানি, বুঝি আমরাই ভ্রমে ডুবিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইলেও, তাঁহাকে বর্ত্তমান জাতীয় ভাবোন্মেষের গুরু বলিয়া স্বীকার করিব। তাঁহার বর্ত্তমান উপদেশ, আর তিনিও দেশীয় হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। জাতীয় ভাব হইতে জাতীয় সমবেত ধর্ম্মের আরম্ভ হইতেছে, ইহা হইতে সুসময়ে সফলতা আসিয়া উপস্থিত হইবেই। কিন্তু কবে সেই সুসময় আগত হইবে, কাহার দক্ষিণ বাহুর উপর কৃতার্থতা স্বর্গীয় সিংহাসন রচনা করিবেন, তাহা তিনিই জানেন, যিনি দীনের বন্ধু, দুর্ব্বলের বল এবং পতিতের চির সহায়। অলমতি বিস্তরেণ। শ্রীশশধর রায়।

* Hebert Spencer Lecture. 1907.

পশুপতি।

—সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধি নাশো
বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥
গীতা।

১

পশুপতি।
পর হিতে বিশ্ব হিতে,
জন্মে দ্বিজ অবনীতে,
তাই তো ব্রাহ্মণগণ নমস্য সবার,
কলঙ্ক কালিমা ঢালি,
সেই কুলে দিতে কালি,
কেন তুমি বঙ্গদেশে এলে কুলাঙ্গার?

২

কি বুভুক্ষা সীমাশূন্য,
দুরাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ,
বিশ্বগ্রাসী বিষমাগ্নি জ্বলিছে উদরে,
পুড়িয়াছে পুণ্যধর্ম্ম,
পুড়িয়াছে জ্ঞানকর্ম্ম,
কে জানে রাক্ষসী ক্ষুধা কত গ্রাস করে!

৩

স্বার্থ,অর্থ, রাজ্য-লোভ,
দুর্ব্বার যশের ক্ষোভ,
নরের নরত্ব নাশি গড়ে এ রাক্ষস,
মোহমত্ত দিবা রাতি,
কপটী বিশ্বাসঘাতী,
নিষ্ঠুর পাষণ্ড ভণ্ড, চিত্তে দুঃসাহস।

৪

জননী জনম ভূমি,
আরামে আছিলা তুমি,
অরাতি আনিয়া মূঢ়! গভীরা নিশায়,
বিজাতি বিধর্ম্মী-পা'য়
বি'কালি নিদ্রিতা মায়,
বজ্রাঘাত ও রাজত্ব—ইন্দ্রত্ব মাথায়।

৫

মানবের হৃদি প'রে,
ধর্ম্ম প্রেম বাস করে,
গড়ে তারা স্বর্গপুরী এ নব ভুবন,
তাইতো সাধুর চিত,
দেব-পদে নিয়ন্ত্রিত,
পরার্থে করেন সাধু আত্ম বিসর্জ্জন।

৬

স্বদেশ-প্রেমিক বীর,
মাতা পিতা রমণীর,
কত ব্যথা কত অশ্রু উপেক্ষিয়া হায়,
সাধিছে দেশের কর্ম্ম,
সার্থক তাদের জন্ম,
মরণে অমৃত মানি অমরতা পায়।

৭

কোথা বা করুণা-তরে,
আত্ম বলিদান করে,
রাজসুখ শাক্যসিংহ ত্যজে অনায়াসে;
মুছিতে পরের পাপ,
সহিয়া অসহ্য তাপ,
প্রিয় মাতা পত্নী ছাড়ি নিমাই সন্ন্যাসে!

৮

জন্মি সে মানব-কুলে,
স্বার্থে যে মহত্ব ভুলে,
স্বদেশ-স্বজাতি-রক্তে যাহার পিপাসা,
ধিক তার পাপজন্ম,
ধিক্ তার প্রতিকর্ম্ম,
ধিক্ তার চিন্তা, ধ্যান, ধিক তার আশা

সাহিত্য-গুরু মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র কৃত "মৃণালিনী" গ্রন্থের পশুপতি-চিত্র দ্রষ্টব্য।

৯

অই মুখে, লক্ষ্মী-সমা,
চাহ কি না "মনোরমা"
শোভিবে শূকর-গলে মণিময় হার ? —
কি ভাবিছ ভাগ্যহীন,
বিধি এত অর্ব্বাচীন ?
মরুদেশে শতদল, এত আশা কার ?

১০

আমি কেন দেই গালি—
হে পশু ! দেখিও কালি,
তুষিতে ও দগ্ধোদর কি করেছ হায়,
শ্মশান সোণার গেহ,
মাতৃরক্তে আর্দ্র দেহ,
সোদরের ছিন্ন শির লুটিছে ধূলায়।

১১

সেই সব শব ঠেলি,
গর্ব্বিত চরণ ফেলি,
বিজেতা দুয়ারে যবে যাবে ভিক্ষা-আশে,
তখন কি বজ্রানল,
পোড়াবে না ভূমণ্ডল,
মরিবে না তৃণ তরু বিষাক্ত বাতাসে ?

১২

উচ্ছ্বসি বারীন্দ্র-বক্ষ,
গর্জ্জিয়া তরঙ্গ লক্ষ,
গ্রাসিবে না লোভাতুরে চিরদিন তরে,
কালফণী ঊর্দ্ধ শিরে,
বিষদন্তে হৃদি চিরে,
দেখাবে না মাতৃঘাতী কত জ্বলি মরে ?

১৩

স্মরিতে শিহরে গাত্র,
শক্র সপ্তদশ মাত্র,
মায়েরে করিলি দাসী আপনার হাতে,
হায়রে স্বার্থের দাস,
ঘটালি কি সর্ব্বনাশ,
আপনি যে ছাই দিলি আপনার ভাতে !

১৪

এ ব্রহ্মাণ্ড নহে শূন্য,
আছে সত্য ধর্ম্ম পুণ্য।
দেবতা কেমনে সবে হেন পাপাচার,
উঠ জাগ বৈশ্বানর।
বঙ্গের হৃদয়-পর,
মাতৃ-ভ্রাতৃ দ্রোহী আজি করগো সংহার।

১৫

অই—
সন্ধানিয়া মৃত্যুবাণ,
জ্বলে অগ্নি লেলিহান,
কালান্ত মরণ-ক্রীড়া সহস্র শিখায়,
দিক্‌পাল দেখে রঙ্গে,
কুযশ রাখিয়া বঙ্গে,
মহাপাপী পশুপতি ভস্ম হয়ে যায়।

*　*　*　*　*

১৬

সেতো গেছে কত দিন
ফুরায়েছে তার চিন্,
তবু মা। নয়নে তোর কেন এত জল—
বল্‌না শিশুর কাছে,
আজো কি সে পাপ আছে,
নাহি কি মা প্রায়শ্চিত্ত নাহি কি অনল ?

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম।

একক্ষণে দেশের চারিদিকে উত্তেজনা দেখা যাইতেছে। এ উত্তেজনার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে যে একটা উত্তেজনা হইয়াছে, তাহা, কি ইংরাজ কি ভারতবাসী, কি রাজভক্ত কি রাজদ্রোহী, সকলেই স্বীকার করিতেছেন। উত্তেজনা কেন হয়, কখন হয়? কখন বা ক্ষতি বোধে, কখন বা অপমান বোধে, কখন বা আত্মরক্ষার চেষ্টায় মনুষ্য-হৃদয়ে উত্তেজনা হয়। আবার কখন বা লাভের আশায়, কখন বা গৌরবের আকাঙ্ক্ষায়, কখন বা কর্ত্তব্যজ্ঞানের তাড়নায়, কখন বা প্রেমের মাদকতায়, কখন বা ধর্ম্মের প্রেরণায় মনুষ্য উত্তেজিত হয়।

ক্ষতি ও অপমান-বোধ-জনিত উত্তেজনায় বিদ্বেষের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। ইহাতে বিরোধ-বুদ্ধি জন্মে, ইহাতে লোককে আঘাতে, কলহে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে। আর গৌরবের ইচ্ছায় কর্ত্তব্যজ্ঞানের ও ধর্ম্মের উত্তেজনায় অধিকাংশ স্থলে শীতল প্রেমবারি বর্ষিত হয়, উসর ভূমি উর্ব্বরা হয়, এবং বিরোধ যদি কখন অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে তাহা অধিক দিন থাকে না; এবং পরিণামে তাহা মঙ্গলপ্রসূ হয়। বিরোধ-বুদ্ধি, বা বিদ্বেষ অতি উগ্র হইলে, মনুষ্য নিজের বলের সহিত শত্রুর বল তুলনা করে না, সময় অসময় বিবেচনা করে না, পরিণামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। "আপনার সর্ব্বনাশ হইবে," অথবা জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা জানিয়াও শত্রুকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়। ধর্ম্মবুদ্ধিজাত উত্তেজনা হিতাহিত বিবেচনা করে, পরিণামে মঙ্গল হইবে, না অমঙ্গল হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখে। অন্যকে আঘাত করা তাহার উদ্দেশ্য নহে, আপনার বা অন্যের মঙ্গল সাধনাই তাহার লক্ষ্য।

উত্তেজনা যে কারণেই সঞ্জাত হউক, তাহাতে মানুষের যে শক্তি বাড়ে, তাহা যে মনকে বলীয়ান, সাহসী ও উদ্যমশীল করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত উত্তেজনা যদি প্রসারিত হইয়া জাতিগত হয়, তাহা হইলে ইহার শক্তি আরও অধিক হয়। কেন না, প্রত্যেকে পরস্পরের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, এবং এইরূপে জাতীয় উত্তেজনার শক্তি ক্রমশই অতর্কিত ভাবে বাড়িয়া যায়; কখন কখন এত বাড়িয়া যায় যে, সে ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় অসহ্য হইয়া উঠে, সম্মুখে যে বাধা পায়, তাহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়, এবং কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ দিকে যাইবে, কেহই বলিতে পারে না। ঐ উত্তেজনায় যাহারা মত্ত হয়, তাহারা প্রাণের ভয় করে না, তাহারা কখন বা ছিন্নমস্তার ন্যায় নিজের রুধির নিজে পান করে, কখন বা একটা মহাবিপ্লব উৎপাদন করে। তাহার দৃষ্টান্ত ফরাসী বিপ্লব।

জাতীয় উত্তেজনা, যেমন একদিকে, সৎপথে যাইলে, দেশের উন্নতিকে সহজে দ্রুতবেগে আনিতে পারে, দশ বৎসরের উন্নতি এক বৎসরে সম্পাদন করিতে পারে, তেমনি অন্যদিকে, তাহা অসংযত হইয়া ক্ষিপ্তভাব ধারণ করিলে, রথের ক্ষিপ্ত অশ্ব যেমন সারথিকে অগ্রাহ্য করিয়া, রথ গভীর খাতে নিক্ষেপ করিয়া আরোহী-

দিগের প্রাণনাশ ঘটায়, তেমনি,জাতীয় উত্তেজনা যদি অসংযত হইয়া ক্ষিপ্তভাব ধারণ করে, তাহা হইলে দেশকে সর্ব্বনাশের অতল সাগরে ডুবাইয়া দেয়।

আগ্নেয়গিরির উদ্গার হইলে নিকটবর্ত্তী জনপদবাসিগণ চকিত হইয়া ভয়াকুল চিত্তে আকাশে অগ্নির লাল আভা দেখে, তাহার পর আগ্নেয়-নিঃস্রবের গতি লক্ষ্য করে, "লাভার" উদ্গারে কোন্ নগর বা গ্রাম ডুবাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করে, এবং আপনাদিগকে তরল অগ্নির প্রবাহ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। তেমনি,যখন বহুদূর বিস্তৃত, গভীর উত্তেজনায় কোন জাতি উত্তপ্ত হয়, এবং সেই উগ্র উত্তেজনার কোন ভীষণ চিহ্ন বাহির হয়,তখন জনসাধারণ স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে ভবিষ্যাকাশের প্রতি দৃষ্টি করে, ব্যাপারখানা কি, ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করে। যখন বুঝে, সমাজ-গর্ভে কোন স্থানে আগ্নেয়গিরি জ্বলিয়াছে, তখন আপনাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। এবম্বিধ জাতীয় উত্তেজনার সময় অতি ভয়াবহ। জাতীয় উত্তেজনা অসংযত,অদম্য ও পরিণাম-বুদ্ধিশূন্য হইয়া, অন্ধ ও ক্ষিপ্ত হইলে, অতি ভয়ানক রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে।

তাই বলি, স্বদেশপ্রেমিকগণ, স্বদেশ-নৌকার নাবিকগণ যেন সাবধান হন। এই যে জাতীয় উত্তেজনার বিস্ময়জনক আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাকে যেন সংযমের ও শান্তিময় মঙ্গল পথে লইয়া যান। যাঁহাদের বুঝাইবার কিছু মাত্র শক্তি আছে, শঙ্কটে যাঁহারা বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া, যাহাতে এই প্রচণ্ড জাতীয় উচ্ছ্বাসে কর্ম্মীগণ শান্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রের পথ অবলম্বন করেন, যাহাতে স্বদেশপ্রেমিক যুবকগণ শোচনীয় আত্মহত্যা-শ্মশানের দিকে ধাবিত না হয়, তাহার জন্য, প্রবীণ স্বদেশ--মঙ্গলপ্রার্থিগণ, বাৎসল্যে, স্নেহে স্বদেশ-প্রেমিকগণকে হৃদয়ে ধারণ করুন, তাঁহাদিগকে মঙ্গলবর্জ্জিত করুণাবহ মরণান্তিক পরিণাম হইতে রক্ষা করুন। বর্ত্তমান সময়ে, দেশের জন্য কাহারও আত্মহত্যার প্রয়োজন নাই: জীবনই প্রয়োজন। কেন না, দেশের শান্তির কর্ম্মক্ষেত্র "পতিত" রহিয়াছে, শ্রমীর অভাবে হাহাকার করিতেছে। এমন জমী, যাতে সোণার ফসল ফলিতে পারে, স্বদেশী কৃষাণগণের অভাবে আবাদ হইতেছে না।

গুপ্ত ভাবে হউক, আর প্রকাশ্য ভাবেই হউক, বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা বৃথা আত্মবলি, নিতান্ত শোচনীয় অমঙ্গলময় আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা বলিতেছি কেন, তাহা কি বুঝাইতে হইবে? ভারত এককালে স্বাধীন ছিল না কি? সে স্বাধীনতা গেল কেন? যে সভ্যতা-রবি একদিন সমুদয় জগতকে জ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম্ম দান করিয়া আলোকিত করিয়াছিল, তাহা অস্তমিত হইল কেন? জগতের কোন দেশে রাজপুতগণের অপেক্ষা অধিকতর বীর্য্য শৌর্য্যময় পুরুষ কখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল কি? করে নাই। ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগের পবিত্র শোণিত দিয়া ভারত-জননীর চরণ-পঙ্কজ অবিরাম ধৌত করিয়াছিল, তথাপি মোগলদিগের সহিত সংগ্রামে বিজয় লাভ করিতে পারে নাই কেন? স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছিল কেন? প্রাচীন গ্রীসে এক "থার্মপলির"

গৌরব-ভেরীতে সমুদয় ইউরোপ অদ্যাপি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু, সমুদয় রাজস্থান "থর্মপলি"ময়। তুমি রাজপুতনার যেখানেই পদক্ষেপ করিবে, সেখানেই পূর্ব্বতন রাজপুতের পবিত্র শোণিতপূত-ভূমি-স্পর্শে তোমার দেহ পবিত্র হইবে। ভারতের ক্ষত্রিয়গণ যেন বীরত্বের অবতাররূপে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তথাপি স্বাধীনতা হারাইল কেন? স্বদেশে স্বাধীনতা রক্ষার বা লাভের জন্য যেমন সাহস, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ চাই, তেমনি আর কি চাহি, তাহা কি স্বদেশী চরমপন্থীগণ ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কি শিক্ষা করা যায়? বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম যেমন কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তেমনি, কোন দেশে কেবলমাত্র একশ্রেণীর মধ্যে বীরত্ব ও স্বদেশিকতা আবদ্ধ থাকিলে সেই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা বা লাভ হয় না। দেশের সমুদয় শ্রেণীর লোক, অন্ততঃ দেশের অধিকাংশ লোক, যখন স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়, সমুচিত জ্ঞান লাভ করে— সাহসে, বিজ্ঞানে, কৌশলে, ঐক্যে, সমন্বয়শক্তিতে, নৈতিক উন্নতিতে, প্রতিযোগী জাতিগণের তুল্য বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তখনই তাহারা স্বাধীনতার যোগ্য হয়। ধর্ম্ম যেমন জাতীয় উৎকর্ষের ফল, তাহার শিখা আপনা হইতেই যেমন ভগবানের দিকে উত্থিত হয়, তেমনি, সমগ্র জাতির উন্নতির সমষ্টি উত্থিত হইয়া জাতীয়-স্বাধীনতায় পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে সে অবস্থা হয় নাই, এবং সে অবস্থা হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। এই অবস্থায় স্বাধীনতার চেষ্টা করা নিতান্ত শোচনীয় ভ্রম, এবং এই ভ্রান্ত চেষ্টাতে দেশের মঙ্গল না হইয়া ঘোর অমঙ্গল হইতে পারে।

সিকন্দরের সময় হইতে ভারতের হাতনাগাত ইতিহাস দেখুন, ভারতের উপর্য্যুপরি পরাভবের কারণ কি? ঐ সমন্বয়ের অভাব— গৃহ-বিচ্ছেদ। বিজয়ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে দিগ্বিজয়ী সিকন্দর পঞ্চনদ ভূমিতে উপস্থিত। কিন্তু পঞ্চনদের হিন্দুরাজারা গৃহবিচ্ছেদে ব্যাকুল ও অবসন্ন। তাহারা সমন্বিত হইয়া যুদ্ধ করিল না। একমাত্র পুরুরাজ যুদ্ধ করিলেন, সুতরাং পরাজিত হইলেন।

আবার যখন মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিল, তখনও ঐ গৃহবিচ্ছেদের শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হইল। অষ্ট শতাব্দীতে যখন আরবদেশের মহম্মদ কাশিম সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিল, তখন হিন্দুরাজা একক যুদ্ধ করিলেন, নিহত হইলেন। তখন রাণী দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। হায়! নিকটবর্ত্তী কোন হিন্দুরাজা এই বীরাঙ্গনাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। তৎপরে—তৎপরে সেইত প্রাচীন লোমহর্ষণ কাহিনী—রাজপুত বীরাঙ্গনাগণ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া নিজের ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করিল। তাহার পরে, রাজপুতগণের ধারাবাহিক ইতিহাস, রাজপুত পুরুষের ও রমণীর ধারাবাহিক আত্মবলি, হৃদয়বিদীর্ণকারী আত্মহত্যার করুণাবহ গাথা। কিন্তু এই ভীষণ নিষ্ফলতার মূলে পাপ ছিল,—গৃহ-বিবাদ, পরস্পরের বিদ্বেষ ছিল। কান্যকুব্জের হতভাগ্য জয়চন্দ্র, দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজকে নষ্ট করিবার জন্য, মহম্মদ ঘোরিকে ডাকিয়া আনিল, অন্যের অনিষ্টসাধনের জন্য নিজের ঘরে দস্যু ঢুকাইল, অন্যকে মজাইল, নিজেও মজিল।

সেকালকার কথা ছাড়িয়া দিন। ইদানীং যাহা হইয়াছে, তাহাই মনে করুন। মারহাট্টার অভ্যুত্থান হইল, পতন হইল কেন? হুলকারে পেশোয়াতে বিদ্বেষ, সিন্ধিয়া হুলকারে বিদ্বেষ। মারহাট্টার সাহস ছিল, বীরত্ব ছিল। কিন্তু সমন্বয় ছিল না। শিখদিগের মধ্যে সুনীতি ও সমন্বয়ের অভাবে তাহাদের পতন হইল।

ইউরোপে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিবেন। স্বজাতির মধ্যেত সমন্বয় আছেই। তাহার উপর,—যখন সাধারণ বিপদ উপস্থিত হয়, তখন ভিন্ন জাতিও সমন্বিত হইয়া সাধারণ শত্রুকে দমন করে, পরাজিত করে। দুর্দ্ধর্ষ নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানে ইউরোপ কাঁপিল। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি তাহাকে দমন করিবার জন্য সমন্বিত হইল, তাই ম্যাবেঙ্গোর বিজেতাকে ওয়াটার্লুতে পরাজিত করিতে পারিল, ফরাসী-কেশরীকে সকলে মিলিয়া ধরিয়া সেণ্ট-হেলেনার পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া ইউরোপের স্বাধীনতা রক্ষা করিল।

স্বাধীনতার জন্য যে সকল গুণ অবশ্য প্রয়োজনীয় ও অপরিত্যজ্য, তাহার একটীমাত্র সমন্বয়ের অভাবে ভারতে কি অশুভ ঘটিয়াছে। আর বাঙ্গালা দেশে অন্য স্বাধীনতার প্রায় সমুদয় উপকরণেরই কম বেশী অভাব। জ্ঞান?— অধিকাংশ বাঙ্গালী অশিক্ষিত। দরিদ্রগণ গভীর মূর্খতায় নিমগ্ন, জ্ঞান-নেত্র অভাবে তাহারা একবারে অন্ধ এবং নিতান্ত দুর্ব্বল। সুনীতি?— বঙ্গদেশে দিন দিনই নীতির অবনতি হইতেছে। সমাজে দিন দিনই স্বার্থপরতা বাড়িতেছে। ঐক্য ও সমন্বয়?—চতুর্দ্দিকে অনৈক্য। মুসলমান ও হিন্দুতে অনৈক্য। বিহারী ও বাঙ্গালীতে অনৈক্য। জমীদার ও রায়তে অনৈক্য। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদিগের মধ্যে অমিল। ধনী ও নির্ধনে অমিল। সরকারী চাকুরে ও বেসরকারী চাকুরেতে অমিল। চাটুয্যে মুখুয্যেতে অমিল। ভাই ভাইতে অমিল। অনৈক্য ও বিদ্বেষ দিন দিন বাড়িতেছে, মোকর্দ্দমাও দিন দিন বাড়িতেছে। এমন মিল নাই, স্বদেশের লোকের উপর এমন আস্থা নাই যে, দশজনে মিলিয়া দেশের লোককে মধ্যস্থ মানিয়া বিবাদ মিটাইয়া লয়। মুখে স্বদেশপ্রেমের ভাণ, কিন্তু সামান্য স্বার্থের জন্য কতজন আদালতে উধাও হইয়া ছুটিতেছে, নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও ভাই ভাইকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই অনৈক্য-বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত দেশে কেমন করিয়া, কেবলমাত্র আত্মহত্যা দ্বারা, কোন মঙ্গল-সাধন হইতে পারে?

এই জন্যই আমরা বরাবরই রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী নহি। এ কথা আমরা কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত বলিয়া আসিতেছি। আমাদিগের "নবপ্রভা" মাসিক পত্রে প্রতি বৎসর কংগ্রেসের পূর্ব্বে এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনে কেবল উপকার নাই, এমন নহে। উহাতে অপকার হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য আমরা বলিয়া আসিতেছি, আবার অদ্যও বলিতেছি যে, রাজনীতির ক্ষেত্র ছাড়িয়া, আবেদন নিবেদনের পন্থা ত্যজিয়া, গবর্ণমেণ্টকে গালি দেওয়া ছাড়িয়া দিয়া, যে সকল ক্ষেত্রে আমাদের নিজের চেষ্টায় দেশের উপকার করিবার ক্ষমতা আছে, সেই সকল ক্ষেত্রে আমাদিগের কার্য্য করা উচিত। অসংযতভাবে গবর্ণ-

মেণ্টের উপর উগ্রভাষা প্রয়োগ করিলে আমাদের লাভ নাই, কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা আছে! দেশের প্রতি প্রেমই আমাদিগের কার্য্যের ভিত্তি হওয়া উচিত। বিদেশীয়দিগের প্রতি বিদ্বেষ বা ক্রোধ আমাদিগের কার্য্যের পরিচালক শক্তি হওয়া উচিত নহে। আর এ কথাও আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কংগ্রেস ইত্যাদি সভার আন্দোলন সত্ত্বেও দেশে যে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম অধিক পরিমাণে সঞ্জাত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কথাগুলি একটু বিস্তৃত ভাবে বলা আবশ্যক। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষক। জমীদার এই কৃষককুলের হর্ত্তা কর্ত্তা। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, জমিদার ও কৃষকগণের মধ্যে দিন দিনই অসদ্ভাবের বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে জমীদারগণ প্রজাদিগের উপকারার্থে জলাশয় খনন, বৃক্ষরোপণ, ধর্ম্মশালা স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ সাধারণের হিতজনক কার্য্য করিতেন। তাহা দিন দিনই কমিতেছে। সেদিন একজন উকীল বলিলেন যে, "আমার পরিজ্ঞাত কোন বাঙ্গালী ধনী কুড়ি বৎসরের মধ্যে, সাধারণের উপকারার্থে, স্বেচ্ছায় একটী মাত্রও পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন, তাহা আমার স্মরণ হয় না।" এই কথাটীর মধ্যে একটু "রেটরিক" থাকিতে পারে। তথাপি অলঙ্কার-বর্জ্জিত করিয়া লইলে এই কথাটী মিথ্যা নহে।

জমীদারদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকদিগের বিষয় বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলেও স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া কঠিন। তাঁহাদিগের মধ্যে, যাঁহারা লিখিবার বা বক্তৃতার সময়, প্রজাবাৎসল্যের উৎস ছাড়িয়া দেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কাহারও ভূসম্পত্তি হয়, তাহা হইলে, তখন তিনি লেখা বা বক্তৃতাভ্যস্ত স্বদেশ-প্রেম বর্জ্জন করেন; তখন খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা, প্রজাদিগের নিকট শুষিয়া খাজনা আদায়ের উদ্যম—তখন প্রজার জন্য জলাশয় খনন ইত্যাদি কার্য্য দূরে থাকুক, প্রজা উঠানের ডোবাটী যদি নিজের খরচে পঙ্কোদ্ধার করিয়া, বৈশাখের দারুণ রৌদ্রে জলকষ্ট নিবারণ করিতে চাহে, তখন আইন কানুনের সাহায্য লইয়া তাহাকে বাধা দেন। প্রজাদিগের পীড়াদায়ক কোন ব্যবস্থার যদি সংস্কারের প্রস্তাব হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ স্বদেশী তাহার আনুকূল্য করেন না।

জমীদার বা দেশের সুশিক্ষিত মধ্যবিত্তগণ কৃষকদিগের উন্নতির জন্য কোন কার্য্য করা দূরে থাকুক, তদ্বিষয়ে যে তাঁহারা কখন চিন্তা করেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিলাতের জমীদারগণের মধ্যে কত ব্যক্তি কৃষি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন এবং সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। হরেস প্লঙ্কেট (Horace Plunkett) একজন লর্ডের পুত্র, তিনি আয়র্লণ্ডের কৃষি ও শিল্প বিভাগের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি স্বজাতির কৃষিকার্য্যে বিস্ময়কর উন্নতি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি কৃষকদিগের উন্নতির জন্য, রাজনৈতিক সংস্রব-বর্জ্জিত, বিশিষ্ট একটী বিশাল সমন্বিত সঙ্ঘ উদ্ভাবন, স্থাপন, পরিবর্দ্ধন ও পরিচালন করিয়াছেন। তিনি কৃষিবিভাগ ও আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে চিরস্মরণীয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমাদের দেশে জমিদার বা মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে অদ্যাপি কোন্ মহাত্মা প্লঙ্কেটের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন? উপন্যাস-লেখক হাগার্ড (Haggard) ইংলণ্ডের কৃষি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পূর্ণ পুস্তক লিখিয়াছেন।

তাঁহার "The poor and the Land" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক সাধারণ লোকেও বেশ বুঝিতে পারে। আমাদিগের দেশের মধ্য-বিত্ত শিক্ষিত লোকের মধ্যে হ্যাগার্ডের ন্যায় কে গরিব কৃষকগণের উন্নতির জন্য চিন্তা ও তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন?

মহাজনগণের করাল কবল হইতে গরিব কৃষকগণকে বাচাইবার জন্য নির্ধন মহাত্মা রিফীসেনের মত, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, কে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিতেছেন? আমাদের দেশে চৌদ্দ বা বার আনা লোক কৃষক। অথচ আমরা এমনি অবিবেচক যে, আমরা যেন বিশ্বাস করি যে, এই চৌদ্দ বা বার আনা লোক দুর্দ্দশা ও মূর্খতাতে নিপতিত থাকিলেও, স্বদেশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া উন্নতিলাভ করিবে। আমরা এমনি মোহে মুগ্ধ হইয়াছি যে, আমরা এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছি, যেন কেবল বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করিলেই, চৌদ্দ বা বার আনা স্বদেশীকে ত্যাগ করিয়াও, আমরা প্রকৃত "স্বদেশী" হইতে পারিব। ইহার অপেক্ষা শোচনীয় ভ্রম আর কি হইতে পারে!

দেশের অনেক ব্যারিষ্টার ও উকীল প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন। কেহ বা ঐ অর্থে জমীদার হইতেছেন। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অল্প লোককেই সাধারণের মঙ্গলজনক কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে দেখা যায়। নিজের গ্রামের লোকে জলাভাবে মরিতেছে, তৎপ্রতি তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই দৃষ্টি পড়ে না। জল নিকাশের অভাবে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তৎপ্রতি তাঁহারা উদাসীন।

যাঁহারা সবজজ বা ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া মান ও অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কত জন সৎকার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন? একটী ঘটনা মনে পড়িল। একজন বড় চাকুরে পেন্সন লইয়াছেন। তিনি নিজের গ্রাম ত্যাগ করিয়া অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "আমাদের বড় জল-কষ্ট, তাই সেখানে থাকিতে পারি না।" শুনিলে কত দুঃখ হয়। এতদিন ধরিয়া দাসত্ব করিয়া, অর্থ উপার্জ্জন করিলেন, অথচ নিজের গ্রামের জন্য, নিজের পল্লীর জন্য, নিজের পরিবারের জন্য, একটা ছোট পুকুরও কাটাইতে পারিলেন না। এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে এক্ষণে বিরল নহে।

অধিকাংশ ধনীগণের স্বভাব দিন দিন এত বিকৃত হইতেছে যে, সাধারণ লোকের উপকার করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের ব্যয়-সম্পাদিত কার্য্যে, তাঁহাদের নিজের কোন অনিষ্ট বা অসুবিধা না হইয়াও যদি সাধারণের কোন উপকার হয়, তাহা হইলে যেন তাঁহারা ক্ষুব্ধ হন।

যতদিন ধনীগণ গরিবদিগের দুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিবেন, জমীদারগণ রায়ত-দিগের কষ্টের প্রতি উদাসীন রহিবেন, যত দিন উচ্চ শ্রেণীর সহিত ও নিম্ন শ্রেণীর সমবেদনা সঞ্জাত না হইবে, ততদিন কখনই আমাদের দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে না।

আর এক কথা, যদি আমা-দিগের দেশের ধনী ও শিক্ষিত লোক স্বদেশী গরিব ও মূর্খ লোকের সুখ দুঃখের সহিত সহানুভূতি করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া আশা করিতে পারি যে, বিদেশী শাসনকর্ত্তারা আমাদিগের সুখ দুঃখের সহিত সম্পূর্ণ রূপে সহানুভূতি

স্থাপন করিতে পারিবেন? বস্তুতঃ আমাদের পাপের শাস্তি আছে। আমরা স্বদেশী গরিব ভাই ভগ্নীর কষ্টের প্রতি উদাসীন ও নির্ম্মম। তাই, আমাদের সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হইতেছে।

কোনও সাহেব যদি কোন গরিব লোকের উপর অত্যাচার করে, আমাদের "পেট্রিয়ট"-গণ চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করেন। ইহা করাও উচিত। কিন্তু, যখন স্বদেশী ধনী কোন গরিবের উপর অত্যাচার করেন, তখন তাঁহারা নির্ব্বাক, তখন তাঁহাদের স্বদেশ-স্নেহ ও মানবপ্রেম একবারে অন্তর্হিত হয়। গরিব লোকের কষ্ট নিবারণের জন্য কয়-জন স্বদেশী 'পেট্রিয়ট" চেষ্টা করেন? বঙ্কিম বাবু আন্দোলনকারী স্বদেশী'পেট্রিয়ট'ছিলেন না; গবর্ণমেণ্টের কার্য্য তীব্র ভাবে আলো-চনা করাই তাঁহার জীবনের কাষ্য ছিল না, কংগ্রেস-মঞ্চে তিনি আরোহণ করেন নাই। তথাপি তিনি বঙ্গদর্শনে বঙ্গের কৃষক সম্বন্ধে যে প্রবন্ধাবলী, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভাবে,প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি প্রকৃত "স্বদেশী" ছিলেন। দুঃখের বিষয়, এক্ষণকার অধিকাংশ "স্বদেশী" আন্দো-লনকারী কৃষকদিগের দুরবস্থার প্রতি নিতান্ত উদাসীন।

গরিবদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে "স্বদেশী"গণের চেষ্টা অদ্যাপি বড় দেখা যাইতেছে না। অদ্যাপি সেই পুরাতন আবেদন নিবেদন গবর্ণ-মেণ্টের নিকট চলিতেছে, free primary educationএর জন্য। কিন্তু আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে এ বিষয় কিছু করিতে পারি বা এ বিষয়ে যে আমাদের কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে অনুভব করি না। যখন আমরা কোন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে অর্থ ব্যয় করিতে অনুরোধ করি, তখন বিস্মৃত হই যে, গবর্ণমেণ্ট ঐ কার্য্যের জন্য বিলাত হইতে টাকা আনিবেন না, আমাদের নিকট হইতে টাকা লইবেন। ঐ টাকা ঠিক আমাদের মতানুযায়ী খরচ হইবে না।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ইহাতে স্বদেশবৎসল ব্যক্তিগণের যে প্রচুর পরিমাণে কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, তাহা যে আমরা অনুভব করি, তাহার নিদর্শন লক্ষ্য হয় না। এই ক্ষেত্রেও কেবল গবর্ণমেণ্টের নিকট মামুলি আবেদন নিবেদন হইয়া থাকে।

সামাজিক বিষয়েও দেখা যায়, দেশ দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। বিবাহে পাত্রপক্ষ কর্ত্তৃক পাত্রীপক্ষকে মর্দ্দন, নিষ্পেষণ ও অর্থরুধির নিঃসারণ করা যে অতি নীচ, ঘৃণিত ও জঘন্য কার্য্য, তাহা সকলেই বুঝেন। কিন্তু সমাজে এই পৈশাচিক প্রবৃত্তির দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কোন কোন গৃহস্থ, মাসিক ২০০৲।৩০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াও, কন্যার বিবাহার্থে ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হন এবং শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, ভগ্নহৃদয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। হিরো-ডোটসের ইতিহাসে পাঠ করা যায়, কোন কোন দেশে প্রাচীনকালে বিবাহের জন্য বাজারে পাত্রীর নিলাম হইত। আমাদের দেশেও হয়ত আর কিছু কাল পরে বাজারে বা এক্সচেঞ্জে পাত্রের নিলাম হইবে। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের ত কোন দোষ নাই। প্রতীকার আমাদের হাতেই আছে। সুখের বিষয়,সংবাদ পত্রে দেখিলাম,এই বিষয় প্রতী-কার করিবার জন্য কতকগুলি ছাত্র একটা সভা করিয়াছেন। ইহাতে ভরসা করা যায় যে,ছাত্রগণ শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন যে,তাঁহা-দের মহামূল্য স্বার্থত্যাগী জীবন রাজনীতি

ক্ষেত্রে বৃথা বিপন্ন ও বৃথা নাশ না করিয়া, অন্যান্য নানা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন।

সহসা আত্মহত্যা করা অপেক্ষা দীর্ঘকাল কষ্ট সহ্য করিয়া সমাজের নানাবিধ মঙ্গল কার্য্য সমাধা করা শ্রেয়।

আত্মহত্যা করিলেই যে একটা গৌরবের কার্য্য হয়, তাহা নহে। অভিমানিনী বঙ্গবধূ শাশুড়ীর বা স্বামীর সামান্য তিরস্কারে আক্ষেপ করে। অলস বালক লেখাপড়া করে না বলিয়া পিতা তাহাকে তিরস্কার করিলে কখন বা আত্মহত্যা করে। তাহাতে তাহাদের গৌরব নাই। কেবলমাত্র জীবনত্যাগে গৌরব নাই। জীবনত্যাগের উদ্দেশ্য ও ফল মহৎ হইলেই জীবনত্যাগ গৌরবান্বিত হয়। এক্ষণে বালকগণের আত্মহত্যার উদ্দেশ্য ও ফল প্রকৃতপক্ষে দেশের হিতজনক নহে। সুতরাং তাহাদের আত্মহত্যাতে পৌরুষ নাই।

গুপ্তহত্যার দ্বারা কোন দেশ স্বাধীন হয় নাই। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। সমগ্র দেশের উন্নতি না হইলে দেশ স্বাধীন হয় না। এ সহজ কথা। বিদেশ-বিদ্বেষ স্বাধীনতার মূল নহে, স্বদেশপ্রেমই স্বাধীনতার জনক। যখন স্বদেশপ্রেম দেশের সমুদয় লোকের উপর ছড়াইয়া পড়িবে, যখন সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ অপর সকল অঙ্গের বেদনা অনুভব করিবে, যখন দেশের অধিকাংশ লোক শিক্ষিত হইবে, যখন নীচতা, ক্ষুদ্র নীচ স্বার্থ দেশের অধিকাংশ লোকের মন হইতে দূরীভূত হইবে, যখন কি গরিব কি ধনী, কি জমিদার কি রায়ত, কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলে আন্তরিক ভ্রাতৃস্নেহে ও স্বদেশপ্রেমে পরস্পরের দ্বারা আলিঙ্গিত হইবে, তখনি দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। হে সাধু স্বদেশপ্রেমিকগণ, আপনারা দেশের প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র দীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের সহিত শান্তিময় সেবা-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউন। হে স্বদেশপ্রেমিকগণ, আপনারা দয়া ও স্নেহে দেশের মূর্খ, গরিব, ভ্রান্ত, পাপী লোকদের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হউন। দেশে শিক্ষা বিস্তার করুন, স্বাস্থ্যের উদ্ধার করুন, অন্ন সংস্থানের উপায় করুন, কৃষিকার্য্যকে উন্নত করুন, রায়তদিগকে রক্ষা করুন, দেশের গৃহ বিবাদ বিসম্বাদ দূর করুন, মিশনারিগণের ন্যায়, দেশে ছড়াইয়া পড়ুন। দরিদ্রের অন্ধকার-কুটীরে জ্ঞানের দীপ লইয়া যাউন, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয় স্থাপন করুন, দুর্ভিক্ষ মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখের নিকট অন্ন লইয়া যাউন, গ্রাম সকল পরিষ্কার করাইয়া, জলনিকাশ করাইয়া, জলাশয় খনন করাইয়া ম্যালেরিয়া ও কলেরা তাড়াইয়া দিন। সাধু স্বার্থত্যাগী-জীবনের দৃষ্টান্ত বলে জনসাধারণকে—ধনী নির্ধনকে —ক্ষুদ্র স্বার্থ, বিদ্বেষ জড়তা ত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ জীবন অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিন। এক কথায়, সকলকে—ধনী ও গরিবকে, হিন্দু ও মুসলমানকে, সর্ব্বশ্রেণীর লোককে, পক্ষপাত ছাড়িয়া, সেবা করুন; কার্য্যে ও উপদেশে সেবাধর্ম্ম বিস্তার ও প্রচার করুন। প্রীতি ও সেবার মধুর বন্ধনে সকলকে বাঁধিয়া ফেলুন; পরকে আপন করুন, দূরকে নিকট করুন, শত্রুকে মিত্র করুন।

এই সেবাধর্ম্ম অতি উদার, অতি বিশাল, ইহা সকল ধর্ম্মেরই মূল মন্ত্র, সকল ধর্ম্মকেই ইহা আলিঙ্গন করে। কেন না, সকল ধর্ম্মই ইহার অন্তর্গত। অভেদ জ্ঞান ইহার

চক্ষু, পরোপকার ইহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, প্রেম ইহার আত্মা। ঐক্য ও সমন্বয় ইহার পুত্র। এই সেবা-ধর্ম্মের এমন সমন্বয়-শক্তি আছে যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে স্নেহে সংযুক্ত করিয়া এক মহাজাতি সৃষ্টি করে, তখন সেবাধর্ম্ম, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-চক্র কৌশল পূর্ব্বক সংযোগ করিয়া, একটী সমন্বিত মহাযন্ত্র সৃষ্টি করে, যে মহাযন্ত্রের প্রত্যেক চক্র আপন আয়তন ও স্থান অনুসারে ঘুরিতে থাকে। তখন এই সমন্বিত কার্য্যের ফলে, সমুদয় সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল সুচারুভাবে সংসাধিত হয়। নবসমন্বিত মহাজাতির ঐক্যতানিক গৌরব-সঙ্গীত, নানা রকমের রাগরাগিণীতে গীত হইয়া, বিশ্বমন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। তখন সেই ঐক্যতানিক ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেব হাসিতে হাসিতে উদিত হন, তখন সেবাধর্ম্ম-বিরাজিত ধরাতল পুলক-কিরণে প্লাবিত হয়। তখন মনুষ্যচিত্ত মঙ্গল আকাশে, সুখ-বিভোর বিহঙ্গের ন্যায়, উল্লাসে উঠিতে থাকে, ছুটিতে থাকে, গাহিতে থাকে—সুদূর মেঘপুঞ্জ হইতে মধুর ঝঙ্কার বর্ষণ হয়, জগৎ-রঙ্গমঞ্চে সেবা-ধর্ম্মের পবিত্র নাটক অভিনয় হয়।

এই সেবাধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। ইহাই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র পথ, সর্ব্বাঙ্গীন স্থায়ী উন্নতির একমাত্র সোপান। ইহা যিনি সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করেন, তিনি দেবতা হইয়া যান্; যাঁহাদিগের উপর অভ্যাস করা যায়, তাহারা ক্রমে দেবতা হইবার যোগ্য হন। ইহা মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করে। স্বদেশ-উৎসর্গীকৃত সাধুগণ, তোমরা এই যুগধর্ম্মের প্রচারক। তোমাদের স্বদেশপ্রেম, তোমাদের আত্মোৎসর্গ—আত্মহত্যা পাপের ও অশান্তির ভ্রান্ত বিপথে যাইলে দেশের মঙ্গল হইবে না, বরঞ্চ প্রভূত অমঙ্গল হইবে। গুণরাশি পুণ্যকর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োগ করিবার জন্য, সেবার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য, ভগবান তোমাদিগের হৃদয়ে এই দিব্যজ্যোতি প্রেরণ করিয়াছেন। নবযুগ-ধর্ম্মে তোমরা শান্তি ও প্রেম, সেবা ও মঙ্গল সংসাধিত কর।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি কি, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া শত্রু মিত্র অনেকেই ইহাকে নানা দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে ছাড়িতেছেন না। অনেক আছেন, যাঁহারা দেশের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহারাও বুঝিতে না পারিয়া এই আন্দোলনের উপর মাঝে মাঝে কটাক্ষ-পাত করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস এম্-এ মহাশয়ের জাতি ও জাতীয় ভাষা নামক যে সুন্দর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধটী গত বৈশাখ মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও এই ত্রুটী লক্ষ্য করিয়া

আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার মূল প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবে তিনি ভাষাকে যে কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা করা সম্ভব কিনা, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। তিনি ভারতীয় ভাষার যে দোষের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা ভারতের বাহিরে সভ্য অসভ্য অনেক জাতির মধ্যেই লক্ষিত হইবে। ভাষায় যৌগিক, যোগরূঢ় ও রূঢ়, এই তিন প্রকার শব্দই থাকিবে। ধাত্বর্থের দ্বারা বিচার করিয়া যদি শব্দ রক্ষা করিতে হয় এবং যে শব্দ ধাত্বর্থ-সম্মত নহে, তাহা যদি বর্জ্জন করিতে হয়, তবে এক কোপে ভাষার অর্দ্ধেক শব্দ ছাটিয়া ফেলিতে হইবে, ইহা একেবারে অসম্ভব। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহার যাহা উপযুক্ত নয়, তাহাকে সেই সম্মান প্রদান করিলে ঐ সম্মানের লোভে সে উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করে। মানব চরিত্রকে উন্নত করিবার এই প্রণালীটী একেবারে বর্জ্জন করা যুক্তিযুক্ত হইবে কি? যাহা হউক, আমি এ বিষয়ের আলোচনায় এখন প্রবৃত্ত হইব না। যোগেন্দ্র বাবু যে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে একটী নাতিহ্রস্ব, নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিতেছি।

যোগেন বাবু সর্ব্ব প্রথমেই বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু জাতির উন্নতির সকল চেষ্টা রাজনীতির একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে এবং সে রাজনীতি কি, না মিণ্টো সাহেবের মাথা ধরিয়াছে কিনা, তাহারই সংবাদ সংগ্রহ করা। যোগেন বাবু তাঁহার উক্তি দ্বারা ইহাই বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান রাজনীতি-ক্ষেত্রের সঙ্গে তিনি একেবারেই অপরিচিত। মিণ্টো মর্লীর Speech বা মাথাধরা তো দূরের কথা, তাঁহাদের বাপের শ্রাদ্ধ বা প্লেগ কলেরার খবর লইতেও যে বর্ত্তমান রাজনৈতিকগণ নারাজ এবং সেই জন্যও যে তাঁহারা Extremist বলিয়া অভিহিত, এই মহা অপ্রয়োজনীয় সংবাদটীও যোগেন বাবু জানেন না, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। আর বর্ত্তমান আন্দোলন নির্জ্জলা রাজনৈতিক, ইহাও একটা নিতান্ত মিথ্যা অপবাদ। জাতীয় শিক্ষা, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টার জন্য যে শত শত লোক প্রাণ দিয়া খাটিতেছেন, ইহা যদি চোখে না পড়ে, তবে আমাদের নিতান্তই দৃষ্টি-দোষ ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে। তবে রাজনৈতিক বাধায় আমাদের সমস্ত উন্নতি আটকাইয়া গিয়াছে বলিয়া যদি সে দিকে একটু বেশী ঝোঁক পড়িয়া থাকে, তবে তাহা স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়াছে, কিছু দোষের হয় নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের রাজনীতি বিভাগ যেরূপ পীড়াগ্রস্ত হইয়াছে, আশু প্রতীকার না হইলে, তাহাতেই যে আমাদের জীবন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহা তো সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন এবং সেই জন্যই সে দিকে বেশী নজর দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। মুখের মধ্যে অনেক দাঁত আছে। কিন্তু যে দাঁতটী পীড়িত, জিহ্বা সব কর্ম্ম ভুলিয়া কেবল সেখানেই যায়, চেষ্টা করিয়া ফিরাইয়া রাখা যায় না। ইহাতে দোষ দিতে পার, কিন্তু স্বভাবের গতি রোধ করিতে পার না। আমাদের রাজনৈতিক জীবন যে স্বাভাবিকরূপে পীড়াগ্রস্ত, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং where

the shoe pinches, এই নীতি অনুসারে, যেখানে অস্ত্রের লেখা, ব্যথাও তথায় এবং যেখানে ব্যথা, হাতখানাও সমস্ত শরীর ছাড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সেইখানেই যায়। ইহাতে রাগ করিলে চলিবে কেন? আগে জীবন রক্ষা, পরে তো উন্নতি। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে এ জাতি যে জীবন-মৃত্যুর সমস্যায় উপনীত হইয়াছে, এ কথা কি কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য আছে? এবং এ সকল ব্যাধির মূল যে ভারতের বর্ত্তমান দরিদ্রতা, তাহাই বা কে অস্বীকার করিতে পারে? এ দরিদ্রতার মূল যে আবার বর্ত্তমান অস্বাভাবিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই স্বীকার করিতেছেন। ইহা আমাদের অজ্ঞানতা বিজৃম্ভিত প্রলাপ নহে, কিন্তু বিলাতের ও এ দেশের অর্থনীতিবিদ্‌গণ এক বাক্যে তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। ডিগ্‌বি সাহেব, দাদাভাই নৌরজী ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মহাত্মাগণ ইহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এমন কি, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্ত বহুদিন পূর্ব্ব হইতে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। Sir W Hunter বড় লাটের সভায় ১৮৬৯ খ্রীঃ বলিয়াছিলেন, "The Government assessment does not leave enough food for the cultivator to support himself and his family throughout the year." ইহাই কি দুর্ভিক্ষ নহে এবং ইহাই কি দরিদ্রতার কারণ নহে? সমাজ সংস্কারই কর, আর চরিত্রের উন্নতি করিয়া বুদ্ধ যীশুই হও, এ মৃত্যুর হস্ত হইতে কি রাজনৈতিক কর্ম্ম চেষ্টা ছাড়া আর কিছুতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে? যে শাসন প্রণালী এই দরিদ্রতার কারণ, তাহার আমূল সংস্কার ছাড়া এ বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার নাই এবং রাজনৈতিক কর্ম্ম-চেষ্টা ছাড়া ইহার সংস্কারেরও আর পন্থা নাই। পুত্রকে সাপে কামড়াইয়াছে এবং পিতা আপনার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য ও অর্থ নিয়োগ করিয়া ওঝা আনাইয়া তাহার প্রতিবিধানে নিযুক্ত। এমন সময়, যদি কোন বুদ্ধিমান্ আসিয়া বলেন "ওহে তুমি তো ভারী নির্ব্বোধ, সব টাকা খরচ করিয়া ফেলিলে? তারপর, পুত্রের শিক্ষার জন্যই বা কি ব্যয় করিবে, আর পুত্রের বিবাহে নববধূকেই বা কি যৌতুক দিবে?" তাহা হইলে, যেমন দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়, বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীগণকে আক্রমণ করিয়া আমরা তেমনি বুদ্ধির পরিচয় দিতেছি।

যোগেন্দ্র বাবু বলেন যে, আগে সামাজিক উন্নতি, তারপর রাজনৈতিক উন্নতি। এই উক্তিটীর মধ্যে একাধিক Fallacy বর্ত্তমান। fallacy আছে বলিয়াই তিনি এ বিষয়ে স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট হইয়াছেন। তিনি আবার নিজেই বলিতেছেন যে, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি একত্র আরম্ভ করিলে পরস্পরের সাহায্যে সকলেই চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। যদি সকল উন্নতি পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ, তবে একটা আর একটার আগে আরম্ভ হইবে কেন, এ যুক্তি বুঝা গেল না। তারপর, কতটা সামাজিক উন্নতি হইলে স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ততা লাভ হয়, তাহাও আমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হয় নাই। যদি বলা হয় যে, সামাজিক উন্নতি পরাকাষ্ঠা লাভ করিলে রাজনৈতিক উন্নতি আরম্ভ হইবে, তবে বাস্তব জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে

ইহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কেন না, জগতে যাঁহারা রাজনীতিতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, তাঁহাদের সমাজ উন্নতিতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই। আমেরিকায় বা ফ্রান্সে ভূরি ভূরি সামাজিক দোষ ত্রুটী লক্ষিত হইবে। অন্য দিকে আবার জগতে এমন অনেক দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বর্ত্তমান, যেখানে সমাজ ভারতীয় সমাজ অপেক্ষা কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নহে। সুতরাং আগে সমাজ উন্নত কর, পরে রাজনৈতিক অধিকার লাভের চেষ্টা করিও, ইহা একটা নিতান্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। আর একটা কথা এই যে, সমাজ বা রাজনীতি জাতীয় জীবন-শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ। সুতরাং আগে তোমার প্লীহাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কর, পরে তুমি লিভার পাইবে, বলাও যা, আগে সমাজ সংস্কার কর, পরে তুমি রাজনৈতিক অধিকার পাইবে, ইহা বলাও তা। অথবা তোমার লিভার যখন আমার অপেক্ষা দুর্ব্বল, তখন তুমি আমার অপেক্ষা সবল ফুসফুসের অধিকারী হইতে পার না, ইহা যে শ্রেণীর যুক্তি, তোমাদের সমাজে যখন গলদ আছে, তখন তোমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইতে পার না, ইহাও সেই শ্রেণীর যুক্তি। উভয়ই সমান অশ্রদ্ধেয়। শরীরে কোনও স্থানে আঘাত লাগিলে, সমস্ত রক্তের গতি যেমন সেই দিকে হয়, শরীরে বিষ প্রবেশ করিলে যেমন সমস্ত শরীরই সেই বিষকে বাহির করিয়া দিবার জন্য চেষ্টিত হয়, আমাদেরও রাজনীতি অঙ্গ বিশেষ আহত বলিয়া অতি স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের সকল চেষ্টা সেই দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাস্তবিক আমরা আর সকল ভুলি নাই। আমার প্লীহাটা বড় হইলে, ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া আমি তাঁহাকে কেবল প্লীহার কথাই বলি, আর কোন কথা বলি না। যাহাতে প্লীহা সুস্থ হয়, সেই ব্যবস্থা করিবার জন্যই ডাক্তারকে বার বার অনুরোধ করি। এ কার্য্যে ইহা বুঝায় না যে, আমি কেবল একটা প্লীহা মাত্র এবং আমার অন্য কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই বা তাদের বিষয়ে অমনোযোগী। ইহার কারণ এই যে, প্লীহাটা বেশী রুগ্ন, সুতরাং তার ব্যবস্থা আগে করা কর্ত্তব্য। নতুবা ক্রমে সকল যন্ত্রই বিকল, হইয়া সমস্ত দেহের বিনাশ সাধন করিবে। আমাদের রাজনৈতিক যন্ত্র অত্যন্ত বিকল, তাহাকে সারিতে না পারিলে যে জাতীয় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং তাহার জন্য বেশী মনোযোগ অত্যন্ত স্বাভাবিক, না করিলে অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইত। তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইত যে, আমরা মরিয়া গিয়াছি। তবে যাঁহারা মনে করেন যে, আমরা আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় সুখে শান্তিতে আছি, এবং আমরা এখন নির্ব্বিঘ্নে অন্যান্য উন্নতির চেষ্টা করি, তাঁহাদের অবস্থা যক্ষ্মা রোগীর অবস্থার সমতুল। মৃত্যু যতই নিকটবর্ত্তী হয়, রোগী ততই মনে করে, আমি বেশ আছি, তারপর মৃত্যুর দিন মনে করে, আমি সারিয়া গিয়াছি।

আর একটা কথা এই, ভারতবাসী কি বাস্তবিকই সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করিতেছে না? এ অপবাদটা নিতান্ত মিথ্যা অপবাদ। সামাজিক উন্নতিরও চেষ্টা হইতেছে, তবে অতি স্বাভাবিক কারণে রাজনৈতিক চেষ্টা ও উদ্যম বেশী। তবে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের মধ্যে যে সমাজসংস্কার-বিরোধী নাই, তাহা নহে। কিন্তু সেটা তাহাদের রাজনীতির দোষ নহে, বুদ্ধির

দোষ। দেশে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন না থাকিলেও, তাঁহারা সংস্কারের বিরোধী হইতেন। সুতরাং তাহাদের দোষ রাজনীতির ঘাড়ে চাপানটা একটা fallacy মাত্র। তারপর ভারতের সমাজ অন্ততঃ তিন চার হাজার বছরের প্রাচীন, কিন্তু রাজনীতি নিতান্ত অর্ব্বাচীন। সুতরাং এ দুয়ের পরিবর্ত্তন এক শ্রেণীর অন্তর্গত নহে।

আর একটী গুরুতর বিষয়ে যোগেন বাবু বর্ত্তমান আন্দোলনের ভিতরকার কথা ধরিতে অসমর্থ হইয়াছেন। যাঁহারা স্বরাজ চাহিতেছেন, তাঁহারা এ কথা বলেন না যে, স্বরাজ পাইলেই স্বরাজোচিত গুণ আকাশ হইতে তাঁহাদের জন্য ঝুপ করিয়া পড়িবে, বরং তাঁহারা বলিতেছেন যে, স্বরাজ না পাইলে এই সকল গুণগ্রাম লাভের উপায় নাই। সেই জন্যই তো স্বরাজের আন্দোলন এত শক্তিশালী হইয়াছে। আন্দোলনের মধ্যে এ কথা কেহ কখনও বলে নাই যে, পড়া মুখস্থ না করিয়াও পরীক্ষা-মন্দিরে প্রশ্নের উত্তর আপনা হইতে জুটিয়া যাইবে। বরং এই কথাই বলা হইতেছে যে, স্বরাজ ছাড়া পড়া মুখস্থ করিবার উপায় নাই, পরীক্ষা তো দূরের কথা। অধীনতায় স্বাধীনতার উপযোগী মানসিক ক্ষমতা জন্মে না, এই কথার উপর টিপ্পুনি করা যোগেন বাবুর মত বিদ্বান্ লোকের উপযুক্ত হয় নাই। যে সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্ত বসিয়াছিলেন, সেই সিংহাসনে বসিলেই চন্দ্রগুপ্ত হওয়া যায় না, তাহা ঠিক্। কিন্তু সেই সিংহাসনে বসিবার অধিকার থাকিলেই মাঝে মাঝে চন্দ্রগুপ্ত অশোক জন্মগ্রহণ করে। যদি সে সিংহাসনের ত্রিসীমায় কাহারও যাইবার অধিকার না থাকে, তবে কোন কালেই যে একটা সাধারণ রাজাও জন্মিবে না, অশোক তো বহুদূরের কথা, এ কথা কি যোগেন বাবু অস্বীকার করিতে পারেন? "Go to the Chair and the Chair will make you a Deputy Magistrate"---এই উক্তিটী যে গভীর অর্থপূর্ণ, তাহা কেহ স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। পরমুখাপেক্ষিতায় বর্দ্ধিত হইয়া স্বাবলম্বন শিক্ষা করিবার চেষ্টাও যা, অধীনতায় পুষ্ট হইয়া স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টাও তা, একই কথা। যোগেন বাবু যে দৃষ্টান্তটী দিয়াছেন, তাহার অর্থ তিনি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বালক কি কেবল পড়া মুখস্থ করিয়াই পরীক্ষা-মন্দিরে উপস্থিত হয়, তাঁহাকে কি সারা জীবন পরীক্ষা-মন্দিরের apprenticeই করিতে হয় না? তাহাকে কি সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষার apprenticeshipএর ভিতর দিয়া তবে পরীক্ষা-মন্দিরে উপস্থিত হইতে হয় না? এই Kindergarten system সর্ব্বত্রই প্রযুজ্য। যে বালক পরীক্ষা-মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে পরীক্ষা কি করিয়া দিতে হয়, তাহা জানে না, পরীক্ষা-মন্দিরে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তা ঠিক তো মন্দিরের দ্বার হইতেই অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, দুই বৎসর ধরিয়া যতই পাঠ মুখস্থ করুক না কেন। এরূপ ছাত্রের শিক্ষকের প্রতিও বেতন ছাড়া আরও কিছুর—বেত্রের ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। সেই জন্যই স্কুল কলেজকে পরীক্ষা-মন্দিরে পরিণত করিয়া কত কৌশলে ছাত্রকে পরীক্ষায় অভ্যস্ত করিতে হয়। তাহাকে কত প্রকারে হাতে কলমে শিখাইয়া দেওয়া হয়

সে, কলেজে কেতাব লইয়া আসিলেও পরীক্ষা-মন্দিরে কেতাব লইতে নাই, কলেজে কথা বলিতে পারিলেও পরীক্ষা-মন্দিরে একেবারে নির্ব্বাক থাকিতে হয়। সুতরাং সময়ে সময়ে স্কুল কলেজ একেবারে পরীক্ষা-মন্দিরে পরিণত হয়। কেন না, কলেজের হাবভাব পরীক্ষা-মন্দিরের নহে। সব রকম শিক্ষায় যে কিণ্ডারগার্টেন প্রথার এত আদর, রাজনৈতিক শিক্ষার বেলায় কোন্ বিভীষিকা আমাদিগকে সে পথ-ভ্রষ্ট করিতেছে? রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও লর্ড রিপন এই প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এখন সেই নীতির বিস্তর বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, এবং সেই জন্যই আন্দোলন বাড়িয়াছে।

জলে না নামিয়া সাঁতার শেখার দৃষ্টান্তটা সর্ব্বজন বিদিত। যোগেন্ বাবু বলেন, সাঁতার শেখার পূর্ব্বে অঙ্গ সঞ্চালন শিক্ষা প্রয়োজন। যে অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে না, কিম্বা পঙ্গু, সে সাঁতার শিখিতে পারে না, একথা সত্য। কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে না, এমন লোক বিরল হইলেও সকলেই সাঁতার জানে না কেন? যোগেন বাবুর বোধ হয় চৌবাচ্চার জল নাড়া ছাড়া সন্তরণের অন্য অভিজ্ঞতা নাই, তাই বোধ হয়, তিনি স্থলে অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারাই সন্তরণ শিক্ষা করা যায়, এই হাস্যকর প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় আরও মনে করিয়াছেন যে, ভারতবাসী মধ্য আফ্রিকার নিগ্রো অপেক্ষা রাজনৈতিক অঙ্গ সঞ্চালনে অধিকতর দক্ষ নহে। কিন্তু যাঁহারা জানেন যে, এই বিশাল ভারত-ক্ষেত্রটা ভারতবাসীই চালাইতেছে, তবে তাহাদের মাথার উপর বসিয়া যাঁহারা কেবল মাত্র নাম সই করিয়া মাসে চারপাঁচ হাজার টাকা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা সাক্ষী গোপাল মাত্র, তাঁহারা অবগত আছেন যে, ভারতবাসীর রাজনৈতিক অঙ্গ সঞ্চালনের কিছু মাত্র অভাব নাই, অধীনতায় যতদুর সম্ভব তাহা হইয়াছে, এখন কেবল মাত্র গা ঝাড়া বাকী। অঙ্গ সঞ্চালনের কিছুই ক্রটী নাই।

যোগেন বাবু গায়ের জোরে যাহাই বলুন না কেন, স্বাধীন দেশের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—"It is liberty alone that fits man for liberty" তাহা অপেক্ষা উচ্চতর উপদেশ আমরা আর কোথাও পাইতে পারি না। আমরা ভারতবাসীকে যদি নিতান্ত নিগ্রো বলিয়া না ঠাওরাই, তবে মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের এই মহাবাক্য অবশ্যই গ্রহণ করিব। বাস্তবিক যদি অধীনতায়ই স্বাধীনতার উপযোগী গুণগ্রাম লাভ হয়, তবে স্বাধীনতা ও অধীনতায় পার্থক্য কি? চরিত্রের উন্নতিই উদ্দেশ্য। অধীনতায় যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে স্বাধীনতার জন্য এত হাঙ্গামা কেন? ইহা যাহারা বুঝেন না, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই লর্ড মেকলে বলিয়াছেন—"The maxim is worthy of the fool in the old story who resolved not to go into water till he had learnt to swim. If men are to wait for liberty till they become wise and good in slavery they may indeed wait for ever."

আসল কথাটা এই, কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়া মানুষ কখনও মানসিক উন্নতি করিতে সমর্থ হয় না। যোগেন বাবু যে ভাবে কথাটা তুলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, আগে মানুষ আকাশে বসিয়া মানসিক উন্নতি সম্পন্ন করিবে, তারপর সেই উন্নতির সাহায্যে সামাজিক উন্নতি হইবে এবং সর্ব্বশেষে রাজ-

নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা হইবে। এ প্রণালী নিতান্ত ভ্রান্ত। উন্নত সমাজে বাস করিলে মানুষের মন উন্নত হয়। সমাজের যেরূপ নিয়ম প্রণালী, সেই অনুসারে চরিত্র গঠিত হয়। একজন ইংরাজ কুলি বলে—"What the Deuce do I care for the Prince of Wales, will he come and fill my belly ?" অথচ করিবার Grand Dukeএর কুর্ণীশ করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্ত হইতে হয়, ইহা কিসের ফল ? Shakespeare-কে জুলুদের মধ্যে নিয়া রাখিয়া দিলে কি তিনি Shakespeare হইতেন, না কুকীদের মধ্যে বসিয়া বাল্মীকি সীতা চরিত্র অঙ্কন করিতে পারিতেন ? মানসিক উন্নতি আগে, তারপর সামাজিক উন্নতি, ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক কথা, সামাজিক আব হাওয়ার উপর সাধারণতঃ মানুষের মানসিক উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। কর্ম্মক্ষেত্রেই মানুষের চরিত্র গঠিত হয়, শক্তি বিকাশিত হয়। John Stuart Mill বলিয়াছেন "Capacity for nobler feelings in most natures a very tender plant, easily killed, not only by hostile influences, but by mere want of sustenance, and in the majority of young persons it speedily dies away if the occupations to which their position in life has devoted them, and the society into which it has thrown them, are not favourable to keeping that higher capacity in exercise." সুতরাং কি রূপে যে অরাজ বা পররাজের মধ্যে স্বরাজোচিত গুণাবলী উন্নতি প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। রাজনৈতিক জীবনের উচ্চতর কর্ম্মক্ষেত্র সকল হইতে বঞ্চিত হইয়া কখনও কোন শিক্ষাক্ষেত্রেই তদুচিত গুণগ্রাম লাভ হইতে পারে না। যোগেন্ বাবু তো ভাষার উন্নতির দ্বারা মানসিক উন্নতিক সাধনের কথা বলিয়াছেন ? কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার যদি উন্মুক্ত না থাকে, তবে কর্ম্মচেষ্টাই বা আসিবে কোথা হইতে, কর্ম্মের উত্তেজনা না থাকিলে হৃদয়ে মহৎ ভাবই বা আসিবে কোথা হইতে, এবং হৃদয়ে যদি উচ্চ ভাব না থাকে, তবে উন্নত ভাষা কি আকাশ হইতে সৃষ্ট হইয়া আমাদের কাছে আসিবে ? তারপর আরও একটী কথা। শিভারের বা হৃদযন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইলে যে ঐ ঐ বিশেষ বিভাগেরই শরীরের অনিষ্ট হয়, তাহা নহে, কিন্তু সকল বিভাগেরই কর্ম্ম ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া আসে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের হাত পা বাধা বলিয়া সব ক্ষেত্রেই যে আমাদের কর্ম্মচেষ্টা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে, ইহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সদা সত্য কহিবে, এই বাক্য উচ্চারণ করিলে চরিত্রের উন্নতি হয় না, কিন্তু ঐ বাক্য অনুসারে কার্য্য করিলে। যাহা সত্য বলিয়া ভাবি, তাহা যদি প্রকাশ করিয়া বলিতে না পারি বা সেই অনুসারে কার্য্য করিতে না পারি, তবে কি আমার চরিত্র উন্নত হইতে পারে ? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু আমার মুখ বন্ধ। আমার বিবেক কিন্তু একটী। রাজনৈতিক বিবেক বা সামাজিক বিবেক বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিবেক নাই। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া কপটতা করিয়া করিয়া আমাদের বিবেক একেবারে ভোতা হইয়া যাইতেছে, আর নড়ে না। ইহা পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল। যাহারা ভাবেন যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাহস দেখাইতে পারি আর না পারি, এস আমরা সমাজ-সংস্কারে বীরপুরুষ সাজি,

তাহারা যে মানব চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, তাহা বলিতে পারি না। একটা পা আমাদের বাধা আছে, থাকুক, আর একটা পা তো খোলা আছে, তবে এস আমরা হাটিব না কেন, একথা বলিলে কি হাস্যাস্পদ হইতে হয় না? একটা পা যদি এমন ভাবে বাঁধা থাকে যে, নড়িলেই তাহার উপর আঘাত পড়ে, তাহা হইলে ও পদ তো বন্ধ হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে আর এক পদের সঞ্চালন বন্ধ হইয়া যায়। কেন না, পা দুটীর এমন সম্বন্ধ যে একটী নড়িলেই অপরটীও নড়ে। সুতরাং একটীকে আঘাত দিবার ভয়ে আরটীও ধীরে ধীরে নিশ্চল হইয়া যায়। জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র গুলিরও সম্বন্ধ ঐ রূপ। এক দিক বন্ধ করিয়া দিলে ধীরে ধীরে সব দিক বন্ধ হইয়া যায়। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এক যোগে আবদ্ধ, একটাকে বন্ধ করিলে সব গুলি বাধা পড়ে। যাঁহারা মনে করেন, মানব জীবন একটী অট্টালিকা একটী একটী বিভাগ নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে গড়িয়া তোলা যায়, তাহারা ভ্রান্ত। মানব জীবন organism, উহা ভিতর হইতে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমবেত ভাবে বর্দ্ধিত হয়। আগে সমাজ, পরে রাজনীতি, এইরূপ একটী একটী করিয়া গঠন চলে না। তবে যে আমি বলিয়াছি, এখন রাজনীতির দিকে জাতীয় জীবনের বিশেষ ঝোঁক পড়িয়াছে, তাহাও organism এর একটী স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়াছে। জাতীয় জীবনের একটা বিশেষ Necessity হইতেই উহা উৎপন্ন হইয়াছে। বাহির হইতে বাধা দিয়া ইহাকে বিরক্ত করিতে চেষ্টা করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। Cowper বলিয়াছেন—

"I could not endure the room in which I now write were I conscious that the door were locked. In less than five minutes I should feel myself a prisoner, tho' I can spend hours in it under an assurance that I may leave it when I please without experiencing any tedium at all."

ইহার মত সত্য কথা আর নাই, ইহা মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কথা। আমি এই ঘরে বসিয়া সমস্ত দিন লেখা পড়া করিতে পারি, বাহিরে যাইবার উত্তেজনা একটুও অনুভব করিব না। কিন্তু তুমি যদি বাহির হইতে তালা লাগাইয়া ক্রমাগত বলিতে থাক "তোমাকে আর বাহির হইতে দিব না" তাহা হইলে আধ ঘণ্টার মধ্যে বাহিরে যাইবার জন্য ছটফট করিয়া উঠিব। মানব আর সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা-হরণ সহ্য করিতে পারে না। এ কথা ঠিক যে আমি হয়তো আমার স্বাধীনতার কোনই ব্যবহার করিতেছি না। আমি হয়তো মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমার স্বাধীনতার কথা ভাবিতেছি না। আমি যে স্বাধীনজীব, স্বাধীন-চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমার কাজ করা উচিত, ইহা আমার খেয়ালেই আসিতেছে না। আমি ভাবের প্রবাহে বা গতানুগতিকতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাজ করিতেছি, কিন্তু তুমি যেই বলিলে "তোমাকে আর এ কাজটী করিতে দেওয়া হইবে না"—আমার উপর ফেলিয়া রাখিলে আমি হয়তো সে কাজের দিকে যাইতামই না। কিন্তু যেই তুমি আমার স্বাধীনতা হরণ করিলে, আমার সমস্ত ঝোঁক্ অমনি ওই কাজের উপর যাইয়া পড়িল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁকের ইহাও একটী কারণ। আমাদের

ছাত্রগণকে যদি এ কথা বলা না হইত যে, তোমাদের রাজনীতিতে কোন অধিকার নাই, তাহা হইলে হয়তো তাহাদের শতকরা পঁচানব্বই জন রাজনীতির কোনই ধার ধারিত না। কিন্তু যেই তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিলে, অমনি তাহাদের শতকরা ৯৯ জন সকল ছাড়িয়া কোমর বাঁধিয়া আপনাদের রাজনৈতিক স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য লাগিয়া গেল। যতই তাহাদিগের মাথায় আঘাত করিয়া তাহাদিগকে দাবাইয়া দিতে চেষ্টা হইল, ততই তাহারা মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইল। অনেক সময় অতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগে সামান্য রোগকে গুরুতর করিয়া তোলা হয়, বিনা চিকিৎসায় ফেলিয়া রাখিলেই হয়তো রোগ আপনিই আরাম হইত, কিন্তু চিকিৎসা-বাহুল্যে তাহাকে দুরারোগ্য করিয়া তোলা হইল। আমাদের unrest রোগেরও তাহাই হইয়াছে। আমাদের শাসনকর্ত্তাগণ অতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগে দেশকে পাগল করিয়া তুলিতেছেন। সার্কুলারের উপর সার্কুলার চাপাইয়া ছাত্রগণের প্রকাশ্য দিবালোকে দশজনের সম্মুখে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবার অধিকারের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিলে, তাহারা মাটীর তলে গর্ত্ত করিয়া অন্ধকারে গোপনে বম্বশেল প্রস্তুত করিতে বসিয়া গেল। মানবের প্রকৃতিই এই, তাহাকে যদি ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত কর, সে অন্যায্য অধিকার গড়িয়া তুলিবে। বিলাতের ছাত্রগণ যে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতেছে, ভারতীয় ছাত্রগণকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে গেলে তাহারা তাহা স্বীকার করিবে কেন? কেহ কেহ উপদেশ দিতেছেন, আরও অধিকার হরণ কর, আরও নির্য্যাতন কর। আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তাগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এ ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করুন। তাঁহারা মনে রাখিবেন, এ বিবাদ বাঙ্গালার সঙ্গে নহে, মানব-প্রকৃতির সঙ্গে, বাঙ্গালীকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিতে পারেন, ধরাপৃষ্ঠ হইতে বাঙ্গালীর নাম মুছিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু মানব-প্রকৃতির যিনি স্রষ্টা, মানবজীবনের যিনি বিধাতা, তাঁহার শাসন লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। ইহা না বুঝিয়া তাঁহারা যদি ভ্রান্তপথেই চলিতে থাকেন, তবে ইংলণ্ড ও ভারত উভয়েরই বিষম অমঙ্গল ঘটিবে। ভগবান এ অমঙ্গল হইতে দেশকে রক্ষা করুন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা।

পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে "নব্যভারত" কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার কালে আশা করিয়াছিলেন, বঙ্গভাষাই নব্যভারতের ভাষা হইবে। তাঁহার সে আশা কখন পূর্ণ হইবে কি না, বলা যায় না, তবে শিক্ষিত বাঙ্গালী আজি কালি মাতৃ ভাষার সেবায় বদ্ধপরিকর ও অনেকাংশ সিদ্ধহস্ত হইয়াছে—এ কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারা যায়। পূর্ব্বে শিক্ষাভিমানী বঙ্গীয় যুবক পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মাতৃভাষায় আপন নাম উচ্চারণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন, এমন কি, —বড় অধিক দিনের কথা নহে—উৎসপ্র-

দায়ের মৌখিক কথায় ইংবাজি-বাঙ্গালাব অবাধ মিশ্রনজনিত খিচড়ান্নের গুরুপাকে অস্থিব হইয়া শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে তাঁহাদিগের জন্ম মহাত্মা Southey-বিহিত দণ্ডাজ্ঞাব বিধান কবিতে হইয়াছিল; আব এখন বিলাত-প্রত্যাগত, অন্যথা ইংবাজতন্ত্রে-নিয়ন্ত্রিত, যুবক—পবন্ত, ভাবতের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তব প্রবাসী প্রৌঢ় পর্য্যন্ত মাতৃভাষাব মর্য্যাদা সংবক্ষণে সম্পূর্ণ সচেষ্ট। ইহা নিরতিশয় আনন্দেব কথা, এবং দীনা বঙ্গভাষার পক্ষে পবম সৌভাগ্যেব লক্ষণ, সন্দেহ নাই।

যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি বঙ্গভাষার মর্য্যাদা রক্ষায় ও উন্নতি কল্পে সচেষ্ট, ইদানীং "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" তন্মধ্যে অগ্রণী। অন্যবিধ নানা চেষ্টার সঙ্গে "বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা" প্রবর্ত্তন পক্ষে তাঁহাদিগেব আন্তবিক অনুবাগ ও যত্নেব বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহাদিগেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে ও তজ্জন্য পরিষৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিবা আনন্দ প্রকাশের অবসব পাইয়াছেন। পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের মুখে তদ্বিবরণ আমবা এইরূপ শুনিতে পাই:—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ জন্মলাভেব (?) কিছুদিন পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ও বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের নিকট স্কুল কলেজে বাঙ্গালা সাহিত্যালোচনার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য আবেদন করেন। ইংরাজি স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে বাঙ্গালার শিক্ষাদান অনুচিত বলিয়া গবর্ণমেন্ট তখন পরিষদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয় বহু আলোচনাব পর এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা বচনা পরীক্ষার প্রবর্ত্তন মাত্র করিয়া নিবস্ত ছিলেন। কিছু দিন পরেই বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট শিক্ষা সংস্কাবে প্রবৃত্ত হইয়া ইংবাজি স্কুলে বাঙ্গালা ভাষাব সাহায্যে শিক্ষা প্রবর্ত্তনেব ব্যবস্থা করিলেন। পরিষদেব যে প্রস্তাব কতিপয় বৎসব পূর্ব্বে অনুচিত বোধ হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে সমুচিত বলিয়া গৃহীত হইল। ভারত-গবর্ণমেন্ট Indian Educational Policy, অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে যে Resolution অর্থাৎ প্রস্তাব (মন্তব্য ?) প্রকাশ করিলেন, তাহাতে পরিষদের প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে সমর্থিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার জন্য যে Commission অর্থাৎ অনুসন্ধান-সমিতি বসিয়াছিল, সেই সমিতিও উচ্চ শিক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যেব আলোচনা সমর্থন করিয়া এম্-এ পরীক্ষাতেও বাঙ্গালা প্রবর্ত্তনেব অনুরোধ করেন। আলোচ্য বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নূতন আইন অনুসাবে বিশ্ববিদ্যালয় বিধি সঙ্কলনের জন্য * * * যে সমিতি গঠিত হয়, * * * সেই সমিতির নির্দ্দেশানুসারে উচ্চ শিক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য স্থান পাইয়াছে। নিয়ম হইয়াছে যে,—

(১) প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী ইতিহাসের পরীক্ষায় বাঙ্গালায় উত্তর লিখিতে পারিবে।

(২) উচ্চশিক্ষার মধ্য পরীক্ষায় (Intermediate in Arts পরীক্ষায়) প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঙ্গালা—বা তদ্বিধ অন্য ভাষা—সম্বন্ধে পৃথক্ পরীক্ষা দিতে হইবে, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

(৩) বি-এ পরীক্ষায় প্রত্যেক ছাত্রকে

* "সাহিত্য-সেবক"-প্রতিষ্ঠা-কল্পে, ১৩০২ সালের পৌষ মাসে, আমরা এই কথা আর একবার 'নিবেদন' করিয়াছিলাম।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পরীক্ষা পৃথক্ ভাবে উত্তীর্ণ হইতে হইবে—তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

* * * ১৩০৩ সালে, দশ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ যে প্রার্থনা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আশানুরূপ ফল পান নাই, অধিকন্তু অনেক পণ্ডিতের নিকট উপহাসের পাত্র হইয়াছিলেন, দশ বৎসর পরই পরিষদের সেই প্রার্থনা সর্ব্বাংশে পূর্ণ হইয়াছে। দেশের উচ্চশিক্ষা-কার্য্যে বাঙ্গালার এই স্থান দেখিয়াও পরিষদের বহু দিনের মনোরথ পূর্ণ হইতে দেখিয়া পরিষৎ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন।"*

আমরা পণ্ডিত নহি, পরিষদের প্রার্থিত বিষয়ে পরিহাস করিবার যোগ্যতাও রাখি না; বরং নগণ্য হইলেও, আজীবন বঙ্গ সাহিত্যের সেবক রূপে বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি দর্শনে আনন্দলাভই করিয়া থাকি। কিন্তু বক্ষ্যমান ব্যাপারে, পরিষদের সদস্যরূপ সম্মানের অধিকারী হইয়াও, উহার সহিত পূর্ণমাত্রায় আনন্দ প্রকাশ পক্ষে স্থির নিশ্চয় হইতে পারি নাই। ইহার কারণ—যে সূত্রে, দশ বৎসর পরে, পরিষদের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, সেই Indian Educational Policyর পরিবর্ত্তন। এতদিন ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি যে অপূর্ণ বা লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; কর্জ্জন হইতে ক্রে'ক পর্য্যন্ত যে সকল মহাত্মারা উহার পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী বা পক্ষপাতী, তাঁহারা যে ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ না থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের এক আধটা কার্য্য, বা দু' একটা কথা, কি যেন কেমন একটু অলক্ষ্যে আতঙ্ক উদ্দীপন করে। কর্জ্জনের কার্য্যের কথা আর তুলিয়া কাজ নাই। সম্প্রতি স্কটলণ্ডীয় শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ Sir Henry Craik K. C B, M. P. মহোদয় ঐ শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে—

"A wise observer, of long experience, said to me the other day, 'It would have been a happy thing for India had Macaulay never lived" *

এইরূপ মুখবন্ধের দ্বারা মেকলে-প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি বিলক্ষণ একটু শ্লেষোক্তি করিয়া,

"Why should we teach them that education is impossible without acquiring the English language? What can that impress upon them, except that education is useful only to enable them to undertake those administrative duties which are their absorbing ambition?' * —

ইত্যাকার কথাচ্ছলে ভারতবাসীর ইংরাজি-ভাষা শিক্ষার, পরন্তু তজ্জনিত রাজকার্য্য পরিচালন দক্ষতার আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিবার ইঙ্গিত করিয়া, এবং "If Education is to do anything for them, it must be by making them cultivated gentlemen."—*

ইত্যাদি কথায়, বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় যেন সুসভ্য ও সম্ভ্রান্ত নহেন, এইরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া, উক্ত পদ্ধতির পুনর্গঠন কল্পে এইরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

"We must show the native (!) that education has other aims than to make Babus (!) subordinate officials, and pleaders, we must teach them that there are other spheres of activity for the educated man than the Law Courts and Govern-

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী, ১৩১-২ পৃষ্ঠা।

ment appointments * * * we must recognise that it is a mistake to insist that a man shall not be considered to be an educated man unless he can express his knowledge otherwise than in a language which is not his own. Place no restriction on English as an optional subject, but cease to demand it as the one thing necessary for all"*

উদ্ধৃত বচনগুলি সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন বর্ত্তমান বাবু 'কুলের' প্রতি একটু বিদ্বেষভাব-জড়িত বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজি-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকে অশিক্ষিত বিবেচনা করা অর্ব্বাচীনতার লক্ষণ, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইংরাজি-বর্জ্জিত শিক্ষা, বর্ত্তমান কালে, ভারতবাসীর কি উপকার সাধন করিতে পারে, আমরা নির্ণয় করিতে অক্ষম। ব্যবহারজীবীর ও সরকারি ভৃতিভুকের বৃত্তি ভিন্ন শিক্ষিতের পক্ষে কার্য্যকুশলতা প্রকাশের অন্য ক্ষেত্র অবলম্বনীয় বটে, কিন্তু নিতান্ত পক্ষে মুদীর দোকান বা হলচালনক্ষেত্র ব্যতীত ইংরাজি ভিন্ন তাঁহার গতি কোথা? কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—যে কোন ক্ষেত্রই বলুন, যাহার উন্নতির জন্য আজ দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে, কোনটীরই বর্ত্তমান যুগের উপযোগী প্রকৃত উন্নতি চর্চ্চা মূলে ইংরাজি শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবপর বোধ হয় না। আর Sir Henry Craik এর ও তৎশ্রেণীস্থ ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী পণ্ডিতমণ্ডলীর ঘৃণিত ঐ দুই বৃত্তি পরের হস্তে ছাড়িয়া দিতে, বা "administrative dudies" গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা একেবারে পরিহার করিতেই বা আমরা পারিতেছি কৈ? অতএব, ইংরাজি-বর্জ্জিত বা হতাদৃত শিক্ষা আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার অনুকূল কি না, এবং শিক্ষাপদ্ধতির অন্ততঃ এই অঙ্গের মীমাংসার—মেকলে বা ক্রেক আমাদিগের প্রকৃত হিতৈষী কে, সে পক্ষে আমাদিগের সম্পূর্ণ সংশয় আছে। ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্ত্তনের মূলে ইংরাজি শিক্ষার গতি রোধ না হউক, মন্দীভূত করনের অভিপ্রায় যেন প্রচ্ছন্ন বোধ হয়, আর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রার্থনা পূরণ পরোক্ষভাবে সেই অভিপ্রায়ের অনুকূল বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা-প্রবর্ত্তন আমাদিগের মনে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার করিতে পারে নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় যে এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনা পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, উচ্চশিক্ষার্থীর বাঙ্গালা জ্ঞানের পরিচয় লওয়া পক্ষে তাহাই, বোধ হয়, পর্য্যাপ্ত ছিল। অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধিসঙ্কলন-কর্ত্তাগণের নির্দ্দেশানুসারে ঐ দুই পরীক্ষায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের পৃথক্ ভাবে পরীক্ষার জন্য পাঠ্যগ্রন্থ নির্দ্দেশ করায় পূর্ব্বপ্রথার অপেক্ষা অধিক ফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না, বরং যে cramming নিবারণের জন্য এতদূর চেষ্টা ও আন্দোলনের কথা শুনা গিয়াছে, কতক মাত্রায় তাহারই প্রশ্রয় সাধন করা হইবে। পরন্তু ইতিহাসের পরীক্ষায় বাঙ্গালায় উত্তর লেখা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন করার বিধান, ও তন্নিম্নে সকল শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে ইংরাজি স্থলে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা, উল্লিখিত নিয়মাপেক্ষাও, এক হিসাবে, অধিকতর ক্ষতিজনক বোধ হয়। ইতিহাস পাঠ সাহিত্য-শিক্ষায় অঙ্গ-

* Adopted from quotations in the Modern Review, Vol. III. No. 4 pp. 330 - 31.

তর উপকরণ বলিয়া পূর্ব্বাপর খ্যাতি আছে; —বস্তুতঃ, ধারাবাহিক ঘটনার বা আভ্যন্তরিক অবস্থার যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে, শুদ্ধ ও মার্জ্জিত ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জ্জন ইতিহাস-পাঠকের পক্ষে সামান্য লাভ নহে; প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীকে, প্রথমোক্ত বিধানে, ইংরাজি ভাষা সম্বন্ধে সামান্য মাত্রায় হইলেও, সেই লাভ হইতে বঞ্চিত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আর শেষোক্ত ব্যবস্থানুসারে আমরা সুকুমারমতি শিশুগণের হস্তে গণিত, বিজ্ঞান, জ্যামিতি, পরিমিতি, খগোল, ভূগোল, প্রভৃতি নানা বিষয়ের রাশি রাশি পুস্তক দেখিতে পাই, এবং 'গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক', 'লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক', অম্লমান, যবক্ষার, অনুপূরক-পরিপূরক কোণ, আয়ত ও বর্গক্ষেত্র, হর্শেল ও নেপচুন *, দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা, প্রভৃতি সরল ও সুমিষ্ট বাঙ্গালার রসাস্বাদন করি। এইরূপ পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনের জন্য পরিষৎ বহুদিন যাবৎ চেষ্টিত ছিলেন ও আছেন এবং সঙ্কলন বিষয়ে অনেক পরিমাণে সিদ্ধকামও হইয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে বাঙ্গালার শব্দসম্পদ বৰ্দ্ধিত ও সঙ্কলন-কর্ত্তার পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার সাধিত হয় বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষানবিশ শিশুর পক্ষে Greatest common measureএর বাগর্থপ্রতিপত্তি যেরূপ দুরূপ ব্যাপার, গরিষ্ট সাধারণ গুণনীয়কের জ্ঞানলাভ তদপেক্ষা কম কষ্টসাপেক্ষ নহে; ফলতঃ তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই উহার মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া মুখে G. C. M. বা গ-সা-গু বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। শিশুগণকে ইংরাজি ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি বাঙ্গালায় বুঝাইবার জন্য গঙ্গাধর বাবু প্রমুখ কোন কোন শিক্ষক যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সুসঙ্গত ও সুফলপ্রদ হইয়াছে; কিন্তু 'ঘরট্টপেষক'-জাতীয় শব্দ সহযোগে ইংরাজির অনুবাদে, বা উচ্চশ্রেণীর পরিণতবুদ্ধি ছাত্রগণকে বিষয় বিশেষের আলোচনায় ইংরাজির পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ব্যবহারে প্রশ্রয় দেওয়ায়, কোন ফল নাই।

যাহা হউক, এই নববিধি প্রবর্ত্তন কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উদ্দেশ্যই থাকুক, তৎপক্ষে পরিষদের চেষ্টার মূলে বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি সাধন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উহার একটা বিশিষ্ট স্থান নিরূপণ রূপ সাধু ইচ্ছাই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদিগের অবলম্বিত প্রণালী সর্ব্বথা সমীচীন কি না, ইহাই বিবেচ্য। 'নব্যভারতে'র আশা যতদিন পূর্ণ না হয়—বঙ্গভাষাই যতদিন নব্যভারতের ভাষা না হয়—ততদিন আমরা ইংরাজির বিনিময়ে বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া 'স্বদেশী'-ব্রত সাধনের সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিতেছি না। বস্তুতঃ ইংরাজিই নব্যভারতের Lingua Franca হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—ইংরাজির প্রসাদেই জাতীয় মহাসমিতি প্রভৃতি সার্ব্বজনীন সভাস্থলে ভারতের এক প্রান্তের অধিবাসী অন্য প্রান্তের লোকের নিকটে অনায়াসে মনের ভাব জ্ঞাপন করিতেছেন, ভারতবাসীর হৃদয়ে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা কল্পে ইংরাজিই মূলমন্ত্র। বঙ্গভাষার উন্নতি-চেষ্টায় এহেন ইংরাজি ভাষার প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা প্রদর্শন কোন ক্রমে যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। পরন্তু, বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনের ইহাই কি প্রকৃষ্ট পন্থা? স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রাদি

* পাঠ্যগ্রন্থে এতদূর বাঙ্গালা পৌঁছে নাই।

হইতে অধুনাতন বিদ্যোৎসাহীবর্গ পর্য্যন্ত যাঁহারা বঙ্গভাষাব বর্ত্তমান অবস্থা গঠনের মূল, এবং যে সমস্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি দেশের উচ্চশিক্ষা কার্য্যে বঙ্গভাষা প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন বালো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন? অথচ তাঁহাদিগেরই রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার্থীব পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির জীবনী আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যুগপৎ সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের অভিজ্ঞতাই তাঁহাদিগের কৃত বাঙ্গালা রচনার মূল উপাদান। মাত্র সংস্কৃত-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ—দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন হইলেও—অনেকস্থলেই বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা রচনা করিতে অক্ষম; পক্ষান্তরে, ইংরাজি শিক্ষার প্রথম যুগে মাত্র ইংরাজি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই যে শুদ্ধরূপে আপন নাম স্বাক্ষর করিতেও অক্ষম ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরাজি—এই উভয় ভাষাজ্ঞানের ফলস্বরূপ আমরা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ন্যায় ভাষাতত্ত্বে, 'বিশ্বকোষে'র তুল্য অভিধানে, 'প্রভাতচিন্তা'দির ন্যায় প্রবন্ধ পুস্তকে, 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতির মত মহাকাব্যে, 'নীলদর্পণা'দির ন্যায় নাটকে, 'আনন্দমঠ' প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসে, 'শকুন্তলাতত্ত্বা'দির সদৃশ সমালোচনায়, সিপাহি যুদ্ধা'দির ইতিহাসে, 'মাইকেল' প্রভৃতির জীবন-চরিতে এবং 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থে বঙ্গসাহিত্য অলঙ্কৃত দেখিয়া আনন্দ উপভোগের অবসর পাইতেছি। অতএব আমাদিগের বিবেচনায়, বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন পক্ষে সংস্কৃত ও ইংরাজি শিক্ষা অপরিহার্য্য এবং এতদুভয়ের সাহায্যে বাঙ্গালা রচনায় অনুশীলনই শিক্ষার্থীর পক্ষে যথেষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা কার্য্যে বঙ্গভাষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বাঙ্গালা রচনার প্রকৃতি ও গঠন বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা কোন অংশে উৎকর্ষ-লাভ করিবে কি না বলা যায় না। বর্ত্তমান বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে একদল সংস্কৃতশব্দ-বহুল ও অন্যদল গ্রাম্যশব্দ-বহুল ভাষাগঠনের পক্ষপাতী। ভাষার পারিপাট্য ও ওজস্বিতা সাধন-কল্পে ইহাঁদিগের মধ্যে কোন্ দলের অভীপ্সিত প্রথা প্রকৃত উৎকর্ষবাচক, তৎপক্ষে মতভেদ আছে। তবে সংস্কৃত ও ইংরাজির মধ্যে কোন ভাষার প্রতি হতাদর প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার চর্চ্চা করিলে যে উহার কোন ক্রমেই উন্নতির আশা নাই, ইহা একরূপ সুনিশ্চিত।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

মেঘদূত।

কাব্য-সৌন্দর্য্যে এবং নির্ম্মাণ-কৌশলের অভিনবত্বে কালিদাসের মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে অতি মহামূল্য রত্ন। হংসদূত, কোকিলদূত, উদ্ধবদূত, পদাঙ্কদূত,

পবনদূত প্রভৃতি অনেক কাব্য উহার অনুকরণে রচিত হইয়াছিল। অনুকরণ করিয়া যাঁহারা কালিদাসের মত খ্যাতি লাভের দুরাশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা যেন কবি মেঘদূতের একটী বর্ণনায় পূর্ব্ব হইতেই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন :—

যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদিসরভা লঙ্ঘযেয়ুর্ভবন্তম্
তান্ কুর্ব্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান।
কেবানস্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ?
হেরিয়া তোমার সুদূর গমন, শরভনামে কুরঙ্গ—
লঙ্ঘিতে কোপে তোমারে,স্ববেগে পড়িয়া ভাঙ্গিবে অঙ্গ।
ছত্রভঙ্গ করি দিওগো তাদিগে তুমুল করকা পাতে,
দুরাশায় হেন অক্ষালীন ফল,—অপমান হাতে হাতে।

মূল কাব্যের ছন্দে এবং শব্দ নির্ব্বাচনে যে একটা মাহাত্ম্য এবং মোহ আছে, অনুবাদে তাহা বজায় রাখা অসম্ভব। ভাষান্তর করিবার সময়েও মনে হয়,—"কে বানস্যুঃ পরিভব পদং নিষ্ফলারম্ভ যত্নাঃ ?" কিন্তু কাব্যখানির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই নানাদেশে, নানা ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়াছেন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে উইল্‌সন্ সাহেব উহার ইংরেজি পদ্য-অনুবাদ প্রকাশ করেন, পণ্ডিতটী স্থানে স্থানে অর্থ-বিভ্রাট এবং পাঠ-বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পদ্য রচনায় মাধুর্য্য আছে। বিদেশের ভাষায় কাব্য লেখা দুঃসাধ্য; তথাপি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার এম, এ, যে ইংরেজি পদ্য অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসা করিবার জিনিস। ভাষা বিশুদ্ধ এবং সরল, অনুবাদ যথাযথ, এবং টীকা টিপ্পনি অতি চমৎকার। সুরেশচন্দ্রের গ্রন্থের আর একটা প্রশংসার দিক এই যে, কালিদাস এবং মেঘদূত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। এদেশের অন্য কোন সংস্করণে এ সকল জিনিস নাই। আমাদের কলেজের ছাত্রেরা যদি উহা পাঠ করেন, বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন।

প্রায় ২৭ বৎসর পূর্ব্বে মল্লিনাথ ধৃত পাঠ অবলম্বনে স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেঘদূতের বঙ্গ-পদ্য-অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন আর ঐ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ঐ অনুবাদ প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটী অনুবাদ পড়িয়াছিলাম, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া এখন উহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম-এ, সি-এস্, মেঘদূতের যে পদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহা প্রশংসার উপযুক্ত বলিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়াছে। মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ অনুবাদ পড়িবার সুবিধা পাইয়াছিলাম বলিয়া আমার নিজের একটা "নিষ্ফলারম্ভযত্ন" খাতার খাতে সমাধিস্থ করিয়াছিলাম।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত মেঘদূতের একটী পদ্য অনুবাদ, ভৌগোলিক ও অন্যান্য টীকাসহ প্রকাশ করিয়াছেন। অখিল বাবুর ভাষা ভাল, ব্যাখ্যাও সরল হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ছন্দ এবং শব্দ নির্ব্বাচনের ফলে মেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনি বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। ধূম-জ্যোতি-সলিল-মরুতের সন্নিপাতে রচিত মেঘ আরো গাঢ় হইলে ভাল হইত। অখিল বাবুর অনুবাদে সর্ব্বত্রই এই প্রকারের ছন্দ ও ভাষা:—

কার্য্যে অবহেলা দোষের কারণ
কুবের যক্ষেরে দিলা এই শাপ,

"সহিবে হারায়ে মহিমা আপন,
এক বর্ষ প্রিয়া বিরহের তাপ।"

অপিচ ঃ—

কোথা সেই মেঘ—জড় দেহ যার
ধূম-জ্যোতি-বায়ু-সলিলে রচিত ?
বারতা বহন কোথায় বা আর—
চেতন প্রাণীর যাহা সমুচিত ?

আর একটী কথা। বঙ্গ দেশের সকল সংস্করণই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মল্লিনাথ ধৃত পাঠ অবলম্বনে। সুরেশচন্দ্রের সযত্ন-সংগৃহীত পাঠও মল্লিনাথের পাঠ। শ্রীযুক্ত কে, বি, পাঠক মহাশয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ জিনসেনের পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্যের পরিচয় দেন, এবং উহার অল্প পরেই বোম্বায়ের নন্দর্গিকর ঐ পার্শ্বাভ্যুদয় ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়া একটী চমৎকার সংস্করণ প্রকাশ করেন। রাজা অমোঘ বর্ষের সময়ের কবি ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই তাঁহার কাব্যে মেঘদূত জড়াইয়া নূতন কৌশলে উহার পাঠ রক্ষা করিয়াছিলেন। অত প্রাচীন আর কোন পাঠ পাওয়া যায় না।

যে সকল কবিতা মল্লিনাথের পাঠে পাওয়া যায় না, কিন্তু পার্শ্বাভ্যুদয়ে আছে, তাহা যে সকল কবিতা নয়, তাহার যথেষ্ট আভ্যন্তরিক প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্ত দিতেছি। সকল পাঠেরই ৩১ সংখ্যক কবিতায় 'উদয়ন কথার' উপন্যাস আছে; কিন্তু ষষ্ঠ এবং ৭ম শতাব্দীতে যে অতি প্রাচীন উদয়ন কথা বিস্মৃতির গর্ভে গিয়াছিল, এবং নূতন উদয়ন কথা হইয়াছিল, তাহা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ের কবিদিগের রচনা হইতে জানিতে পারা যায়। বহু প্রাচীন 'উদয়ন কথা' খুব পুরাতন পালি সাহিত্যে যাহা পাই, পার্শ্বাভ্যুদয়-ধৃত পাঠে ঠিক তাহারই উপন্যাস। এই আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতেই বুঝিতে পারি যে, নিম্নের উদ্ধৃত কবিতাটী অযথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। কবিতাটী এই ঃ—

প্রদ্যোতস্যপ্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্রজহ্রে
হৈমংতালদ্রুমবনমভূদত্র তস্যৈব রাজ্ঞঃ
অত্রোদ্ভ্রান্তঃ কিল নলগিরিঃ স্তম্ভমুৎপাট্যদর্পাৎ
ইত্যা গন্তূন্‌রময়তিজনো যত্র বন্ধু ন ভিজ্ঞঃ।

আগন্তুকজনে দেখায়ে দেখায়ে কেহ সেই বৃদ্ধগণ :—
"হেথা প্রদ্যোতের প্রিয় দুহিতায় হরেছিল উদয়ন,
হেথা ছিল আগে অবন্তীপতির খ্যাত স্বর্ণতালবন,
স্তম্ভভাঙ্গি হেথা নলগিরি করী করেছিল বিচরণ।'

নলগিরি যে হাতীর নাম, স্বর্ণতালবন যে উপন্যাসে ছিল, সে কথা খুঁজিয়া না পাইয়াই হয়ত ঐ কবিতা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পালি সাহিত্যের সহিত অপরিচিতেরা রীস্ ডেভিডের বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাসে এই গল্পটী পাইবেন। কাজেই পার্শ্বাভ্যুদয়ের অন্য কবিতাগুলিও গ্রহণীয়। উজ্জয়িনীর পণ্য-বীথিকার বর্ণনায় আছে ঃ—

হারাং স্তারাং স্তরল গুটিকান্ কোটিশঃ শঙ্খশুক্তীঃ,
শষ্পশ্যামান মরকত মণীনুন্মযুখ প্ররোহান্
দৃষ্ট্বা যস্যাং বিপণিরচিতান্ বিদ্রমানাঞ্চ ভঙ্গান্
সংলক্ষ্যন্তে সলিল নিধয় স্তোয়মাত্রাবশেষাঃ।

বিপণি সজ্জিত যথা কোটিহারে ভাতে মধ্যমণি তারি,
বালতৃণসম শ্যাম মরকত, শঙ্খশুক্তি সারি সারি,
বিদ্রুম কতই রয়েছে বিছানো, দেখিলে বুঝিবে বেশ—
মাণিক শূন্য হয়েছে সাগর, জলটুকু আছে শেষ।

উত্তর মেঘের একটী কবিতা বোম্বাই সংস্করণের মেঘদূতে ভুলক্রমে পূর্ব্বমেঘে বসিয়াছে। কবিতাটী এই ঃ—

পত্রশ্যামা দিনকর হয়স্পর্দ্ধিনো যত্র বাহাঃ
শৈলোদগ্রাস্তমিব করিনো বৃষ্টিমন্তঃ প্রভেদাৎ
যোধাগ্রণ্যঃ প্রতিদশমুখং সংযুগেতস্থি বাংসঃ
প্রত্যাদিষ্টাভরণরুচয়শ্চন্দ্রহাসব্রণাঙ্কৈঃ।

পত্রের মতন শ্যামল অশ্ব, জিনিয়া রবির হরি,—
ঢালে মদধারা তোমার মতন, গিরিসম উচ্চ করী;

যোধাগ্রণী তথা দশমুখ সহ সম্মুখ সমরে যুঝি,
ক্ষত ভূষণেতে করেছে অঙ্গে মলিন ভূষণ-রুচি।

আশা করি, ভবিষ্যতে সকল সংস্করণেই এই কবিতাগুলি গৃহীত হইবে। উদ্ধৃত শেষ কবিতাটী উত্তরমেঘের ১৩শ কবিতার পরে গৃহবর্ণনার পূর্ব্বে বসিবে।

অখিল বাবু যেমন তাঁহার অনুবাদের শেষে ক্ষুদ্রাক্ষরে মূলটী মুদ্রিত করিয়াছেন, সকল অনুবাদের পরিশিষ্টেই ঐরূপ মূলটী দেওয়া উচিত। টীকার অংশ অখিলবাবুর খুব ভাল, কিন্তু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক টীকা লিখিবার সময়ে একালের অনুসন্ধানের ফল সযত্নে দেখিয়া লইলে ভাল হইত। টীকা এবং ভূমিকা সুরেশচন্দ্রের ইংরাজি সংস্করণেই খুব ভাল। এদেশের সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের জন্য একালের প্রত্নতত্ত্ব-সম্বলিত টীকা সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া একটী সংস্করণ করিলে টোলের পণ্ডিতদিগকে নূতন সমালোচনার সংস্পর্শে আনা যাইতে পারে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

গিরি-নির্ঝরিণী।

রৌদ্রদগ্ধ পথিকের মরুভু-তৃষায়,
নিবারিলে তৃষ্ণাহারা চিরস্নিগ্ধ জলে,
অমৃত-লহরী কিবা হৃদয়ে বহায়,
চিরছায়াময় স্থল—বিজন বিরলে,
কোন্ প্রেমে, কোন্ স্নেহে, কোন্ মমতায়,
ধর ওই বক্ষে চির সুধা-তরঙ্গিনী!
এ মর্ত্ত্যে বহিছ কোন্ ত্রিদিব-লীলায়,
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রেমে গিরি-নির্ঝরিণী!
আমি বড় ভালবাসি ওরূপ-শোভার,
তাই এ কান্তার ভাল লাগে বিমোহিনী!
কঠোর কোমলে মিশে কি চিত্র শোভার
যেমতি কণ্টকভরা মৃণালে নলিনী।
প্রেমের যুগলমূর্ত্তি প্রকৃতি-বাসরে,
গিরিবক্ষে নির্ঝরিণী আছ কি আদরে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

জগন্নাথের রথযাত্রা।

গান।

১

আবার লইয়া রথ, উজলিয়ে এ ভারত,
যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ, হে বনমালী,
কোথা সে অর্জ্জুন তব সাথ?
এলে বটে পুনরপি, কোথা সেই ধ্বজ—কপি,
শুনিনা সে ভীষণ চীৎকার,
শক্রর শোণিত মাখা, কোথা সে রথের চাকা,
মেদ মজ্জা ক্লেদ চিহ্ন তার?
কোথা সেই শঙ্খ রব, স্তনিত স্তম্ভিত সব—
দিগন্ত ভাঙ্গিয়া কই ছুটে,
কোথা সে গাণ্ডীব ধনু, লৌহময় ভীম তনু,
অর্জ্জুনের বজ্র করপুটে?
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বৃকোদর বীর,
সহদেব কোথা সে নকুল,
আজিও অজ্ঞাত বাস, আজো বিরাটের দাস,
আজিও কি ভাঙ্গে নাই ভুল?
আজিও কি শমী গাছে, সে ধনুক বাঁধা আছে,
বর্ম্ম চর্ম্ম গদা অসি পাশ,
আজিও কি শব রূপে, রয়েছে সমাধি স্তূপে,
মহাশক্তি ব্রহ্মাণ্ড-বিনাশ?

২

কল্পনা আমার নেত্রে, এ পুণ্য ভারত ক্ষেত্রে,
কুরুক্ষেত্র চেয়ে আছে আজি,

বাজিল ভীষণ রণ, কৌরব পাণ্ডবগণ,
দুই দিকে দুই দল সাজি!
কোথা বীর ধনঞ্জয়, রহিয়াছে এ সময়,
কেন সে হয়না আগুসার,
ক্লীব কাপুরুষ বেশে, ঘৃণিত দাসত্ব ক্লেশে,
জীবন যাপিবে কত আর?
সৈরিন্ধ্রী ভারত-রাণী, হায় কি কলঙ্ক—গ্লানি,
কীচকে করিছে অপমান,
পাপিষ্ঠে হরিছে বস্ত্র, পাণ্ডব নিঃস্ব—নিবস্ত্র,
নাহি হয় তেজে আগুয়ান!
দেও গীতা উপদেশ, আবার জাগুক দেশ,
ভীরুতা করিয়া পরিহার.
জাগুক অর্জ্জুন শত, লইয়া স্বদেশ ব্রত,
গাণ্ডীব ধরিয়া পুনর্ব্বার!
বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ভারত করিয়া ধন্য,
লইয়া এসহে সব্যসাচী,
তুমিহে সারথী যার, নিশ্চয় বিজয় তার,
তব পানে তাই চেয়ে আছি।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

জন্মদিনে ভিক্ষা।

পঞ্চবিংশ বৎসরের প্রথম উষায়
সুন্দর দেবতা মোর! প্রণমি তোমায়!
কতদূর, কতদূর, নাথ, আর কতদূর,
তীর্থ-যাত্রা সমাপন হইবে কোথায়!
ক্ষুদ্র কাণা কড়ি এক, তার কিবা অভিষেক,
তার কিবা ঘুরে মরা আশা-নিরাশায়!

হে দেব, বিচিত্র বড়! শুনে হাসি পায়!
শারদের শুভ্রাকাশে চূর্ণ মেঘমালা,
তারে নিয়ে একি রঙ্গ, একি তব খেলা!
সঙ্গী-হারা, লক্ষ্য-হারা, কর্ম্ম-হারা, প্রাণ-হারা,
সেত শুধু শব্দ-হীন দ্বিপ্রহর বেলা,
কোন্ দিগন্তের বুকে, মিশিতে চলেছে সুখে,
সেত তা'ও নাহি জানে, নহেগো উতলা!
হে দেব রহস্য একি কেন তারে ছলা!

সিন্ধুর অনন্ত কোলে একটী লহর,
তা'র সনে ভাব তব, অপূর্ব্ব খবর!
আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান-হীন, অতি তুচ্ছ, অতি দীন,
সেত নাথ, এ বিশাল বিশ্বের ভিতর।
অর্থ-হারা গানে তার, কেন চাহ বারংবার,
প্রকাশিতে আপনার রাগিণী সুন্দর!
এযে স্বপ্নাতীত কথা ওগো বিশ্বেশ্বর!

কোন্ বন-অন্তরালে ফুটিয়াছে কুড়ি,
তা'রি সঙ্গে হে দেবতা, তব লুকোচুরী!
তার ছোট বক্ষ মাঝে, একটু না সুধা রাজে
নাহি তাতে এক বিন্দু সুবাস-মাধুরী!
ক্ষণে ক্ষণে তবু হায়, পদ-ধ্বনি শুনা যায়,
তুমি তারে নিতে চাও সাজাইতে পুরী!
এযে অতি অসম্ভব অচিন্ত্য-চাতুরী!

লীলাময়! তব লীলা দেখেছি অপার;
শুনিনি, দেখিনি কিন্তু হেন কভু আর।
ক্ষান্ত হও এবে তুমি, রুদ্ধ কর রঙ্গভূমি,
সাঙ্গ হোক্ মহা নাট্য জীবন আমার!
তীর্থ-যাত্রা হোক্ শেষ, অন্ত করি সর্ব্ব ক্লেশ,
তোমার চরণ-প্রান্তে ডাক এইবার!
হে বরণা, কর পূর্ণ ভিক্ষা আজিকার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্বদেশ-সেবকের গৌরব।

উচ্চ বংশে জন্ম যার হৃদয় উদার,
বিশুদ্ধ চরিত্র সদা পবিত্র আচার;
শিষ্টাচারী, মিষ্টভাষী, বিনয়ী সরল,
পুণ্য কার্য্যে অবিরত বিবেক প্রবল;
নীতিশাস্ত্রে মহাজ্ঞানী, বহু কার্য্যে প্রাজ্ঞ,
পণ্ডিত দর্শন শাস্ত্রে, ন্যায়ে অতি বিজ্ঞ;
দিবানিশি জপ তপ, দেবতার ধ্যান,
শাস্ত্র আলোচনা সদা ধর্ম্মে ভক্তিমান্;

বহুতীর্থ পর্য্যটন, নিত্য গঙ্গা স্নান,
ব্রাহ্মণে ভকতি সদা দীনে অন্ন দান;
কিন্তু স্বদেশের কার্য্যে নাহি স্পৃহা মাত্র,
ভ্রমেও সেজন নহে প্রশংসার পাত্র!
স্বদেশ-সেবক যদি অতি মূর্খ হয়,
বিদ্বান, ধার্ম্মিক, তার সমকক্ষ নয়।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সেনগুপ্ত।

বিয়োগ।

আহা! যদি পারিতাম করিতে বিভাগ
একেকটী করি অবিরল
জীবনের প্রতি অনুপল,
আর তাহা হ'তে যদি পারিতাম কভু,
বাছিয়া তুলিতে শুধু শুভক্ষণ গুলি—
নেত্র আগে, স্মৃতি আগে তবে বিশ্ব ভুলি'
তা'রি অনুরাগ—
পরাণের অগ্নি দিয়ে করিতাম যাগ।
বাকী টুকু জ্বলে পুড়ে হ'য়ে যেত ছাই;
অৰ্দ্ধ পথে জীবনের প্রার্থনা তাহাই।

সরাই বালুকা রাশি যবে সন্তর্পণে,
শুভ্র স্বচ্ছ আনন্দ তরল
উৎসারিত করে কলকল,—
ভরি' মোর শত রন্ধ্র বক্ষের কলস,
চিন্তাহীন উঠে আসি নিমিষে এপারে,
তখনি আবিলে তাহা পশি' শত ধারে
লুকায়ে গোপনে,
অতৃপ্ত আশাটী মরে যায় শূন্য মনে।

নিশি—দিন,আলো—ছায়া,অশ্রু আর হাসি,
কি দুচ্ছেদ্য লোহার নিগড়ে—
বাঁধা আছে চিরকাল ধরে,
কাহাকে ছাড়িয়া কেহ সরিতে না চা'য়,
কোথায় নিরবচ্ছিন্ন দামিনীর খেলা—
মেঘ-হীন বজ্রহীন স্বর্ণ সন্ধ্যা বেলা,
কেবা তবু আসি'
দেখাইবে বলি যদি, বড় ভালবাসি?
সুখের জনম কথা আনে যেই হাসি,
মরণের অশ্রু জলে যায় তাহা ভাসি',
স্মৃতির প্রদীপ যবে চাহিবে লুকা'তে
অশুভ অপ্রিয় সত্য, শুধু সেই দিন
বিশ্বগ্রাসী প্রলয়ের প্রধোত-প্রভাতে,
নেহারিবে রুদ্ধ-গৃহে সুপ্ত সংজ্ঞাহীন
হতভাগা মোরে, আর বেদনা-বিস্মৃত
সাথে র'বে হাসি রাশি আনন্দ-সম্বল,
যাতনা পড়িয়া র'বে ত্যক্ত অনাদৃত,
আসঙ্গ-বিহ্বল ব্যাপি' সারা ভূমণ্ডল।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী

নন্দন-কানন।

মুকুলিত হইবে কি নন্দন-কানন?
আবার গাইবে পিক,
আমোদিত চতুর্দ্দিক,
আবার দ্বিরেফপংক্তি করিবে গুঞ্জন?
মুকুলিত হইবে কি নন্দন-কানন? ১

উছলিয়া উঠিবে কি নবীন জীবন?
হ'তেছ মা বঙ্গ! তুমি,
জন-শূন্য মরুভূমি;
শুকিয়ে যেতেছ তব স্তন্য-প্রস্রবণ!
ক্ষীরের সঞ্চার তাহে হবে কি এখন? ২

ফুটিবে কি বঙ্গে আর নূতন-জীবন?
আধি ব্যাধি শোকতাপে,
নানাবিধ মনস্তাপে,
বিশেষ আহার্য্যাভাবে বিশুষ্ক-আনন!
বক্ষেতে মৃত্যুর বীজ করেছ বপন! ৩

কেমনে ফুটিবে মাতঃ নূতন জীবন?
কোথা দয়া, কোথা ধর্ম্ম?
কোথা শ্রম, কোথা কর্ম্ম?
কোথায় জীবনামৃত একতাবন্ধন!
কেবলি ত চারিদিকে প্রলাপ বচন!

এই কি জাতীয় ধর্ম্ম দয়া প্রদর্শন?
শত শত নব নারী,
অনাহারী, একাহারী,
বিরলে বিধবা করে অশ্রু-বিসর্জ্জন।
এই কি জাতীয় ধর্ম্ম দয়া প্রদর্শন। ৫

এই কি জাতীয় কর্ম্ম জাতীয় উদ্যম?
যাহা জ্ঞানে বুঝে সত্য,
তাহাকেই দলে নিত্য,
অবলা দলিতে আর আসুর-বিক্রম।
এই কি জাতীয় ধর্ম্ম জাতীয় উদ্যম। ৬

আশীবর্ষী বৃদ্ধ করে বালিকা-পীড়ন।
কামেতে মোহিত হবে,
জলাঞ্জলি লজ্জা ভয়ে
দিইয়া, বেহায়া নাশে সতীর জীবন!
তাহাকে দলিতে বঙ্গে নাহি কোন জন। ৭

জাতীয় সেবার অহো কিবা পণ্ডশ্রম।
এ স্বর্গীয়া স্রোতস্বতী
হায়! কোথা করে গতি,
ভস্মমধ্যে প্রকাশিছে আপন বিক্রম।
জাতীয় সেবার অহো কিবা পণ্ডশ্রম! ৮

না দেখে এ পুণ্যদেবী জীবনকানন,
যেথানে বহিলে মরি,
নানাপুষ্পে শোভা ধরি,
ফুটিবে অচিরে চারু কানন-নন্দন।
না দেখে এ স্রোতস্বতী জীবন-কানন। ৯

না দেখে এ যুবগণ জীবন-কানন।
ববপণে পেয়ে নাশ,
কত গৃহে হা হুতাশ!
কত গৃহে দীর্ঘশ্বাস! বিরলে রোদন।
স্বেচ্ছা-সেবকের হেথা না পড়ে নয়ন। ১০

কত বালা অশ্রুজলে পিতৃ-নিকেতন!
ত্যজে, যবে চলে যায়,
অঞ্চলে পড়িয়া হায়!
দুঃসহ জীবন-ভার করয়ে বহন।
স্বেচ্ছা-সেবকের হেথা না পড়ে নয়ন! ১১

স্পর্শ-দোষে ঘৃণ্য হযে সদা ক্ষুব্ধ মন।
কত লোক শত শত
হয়ে চির মর্ম্মাহত,
হৃদয়ে অনৈক্য-বহ্নি করয়ে পোষণ।
স্বেচ্ছা-সেবকের হেথা না পড়ে নয়ন! ১২

সেবার বড়াই করি বেড়িয়া বেড়ায়!
যেথানে প্রকৃত সেবা,
সে স্থান দেখিছে কেবা,
যেথানে হৃদয়-বল সেবা কোথা তায়?
সেবার তামাসা খেলি বেড়িয়া বেড়ায়। ১৩

যেমন কংগ্রেসী বাবু সেবাও তেমন!
দণ্ডমধ্যে হ'ল সেবা,
তার পর কার কেবা,
দণ্ডেই দেশের হ'ল উদ্ধার-সাধন।
যেমন কংগ্রেসী বাবু সেবাও তেমন! ১৪

যদ্যপি স্বদেশ-সেবা করিবারে চাও,
হও অগ্রে আশুতোষ,
কিম্বা হও চন্দ্রঘোষ,
কঠিন সমাজ-ব্যাধি সত্বর উপড়াও।
নিন্দুকের বাক্যে কভু কর্ণ নাহি দাও। ১৫

স্বদেশ-সেবায় যদি থাকে সত্য মন,
মাথে তুলি লও বেদ,
তুলি দাও জাতিভেদ,
প্রত্যেক মানবে কর সমান দর্শন,
উপশাস্ত্র প্রতি আর রাখিও না মন। ১৬

খ্রীষ্টের আদর্শে কর চরিত্র গঠন,
হও মহাম্মদ মত,
বিশ্বাসী স্বধর্ম্মে রত,
কার্য্য উপস্থিত মন্ত্র করহ সাধন।
কেহ কার মুখাপেক্ষা ক'র না কথন। ১৭

তা'হলে ফুটিতে পারে নন্দন-কানন।
তা'হলে আবার হাস,
হতে পারে পরকাশ,
মাতৃ মুখে হ'তে পারে রোদন বারণ।
তা'হলে ফুটিতে পারে নন্দন-কানন। ১৮

শ্রীমধুসূদন সরকার।

——

ফল্গু-নদী।

১

নহ নীরময়ী তুমি ফল্গু অন্তঃশীলা,
কায়া তব বালুকার সমষ্টি কেবল,
সৃষ্টির অদ্ভুত সৃষ্টি দেবতার খেলা,
বালুকার অভ্যন্তরে তটিনী শীতল।

২

শত শত নর নারী বক্ষের উপর,
পিতৃ-পুরুষের পিণ্ড করিতেছে দান,
এ দৃশ্য মরমস্পর্শী করুণ সুন্দর
পবিত্র প্রফুল্ল যথা ত্রিদিব মহান্।

৩

সুবিশাল বক্ষে তব খোদিয়া বালুকা,
বাপীর মতন করি তুলিয়াছে জল,
নর নারীগণ—আহা মিষ্ট-মধু মাখা,
এই স্বল্প জল সদা সর্ব্বদা শীতল।

৪

বক্ষোপরি মহাযজ্ঞ হয় প্রতিদিন,
পবিত্র তুলসী পত্রে সজ্জিত সতত,
ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ, রজঃ তম গুণহীন
অনুক্ষণ অনুদিন মন্ত্র-মুখরিত।

৫

তটভূমে রাম-শীলা বিচিত্র পাহাড়,
শত গুল্ম লতা তরু স্বভাবের শোভা,
হেতায় নিবাস যেন শত দেবতার,
শত সুর হেতা যেন ঢালিছে প্রতিভা।

৬

তব তটে স্থিত ফল্গু প্রশান্ত মন্দির,
অভ্যন্তরে "গদাধর" করেন বসতি,
উচ্ছ্বসিত সদা প্রেম-উচ্ছ্বাস-গভীর
হেতা "পাদপদ্মে" পিণ্ড পড়ে নিতি নিতি।

৭

ওহো কি করুণ-দৃশ্য হেরিলে হৃদয়,
কি এক মহান্ ভাবে হয় বিমোহিত,
মনে হয় স্বর্গ ইহা মর্ত্ত্য-ধাম নহে
সকলের সার শোভা হেথা একত্রিত!

৮

পর পারে,"সীতা-কুণ্ড" দেখিতে সুন্দর,
প্রস্তরে নির্ম্মিত হেতা শত দেব দেবী,
চতুর্দ্দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ পাহাড়, প্রস্তর,
প্রকৃতি এঁকেছে যেন অলকার ছবি।

৯

তটভূমে আর কত সুন্দর পাহাড়,
নির্ঝরিণী ঝরিতেছে পাহাড়ের গায়,
সৌন্দর্য্য ঝরিছে যেন রৌপ্য মেখলার,
সাজিয়াছে ছবি যেন সহস্র শোভায়।

১০

প্রকৃতির মহালীলা এই গয়াধাম,
পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্যের প্রিয় বাস-ঘর,
কিন্তু সব শোভা মাঝে ফল্গুই প্রধান
শোভিছে গয়ার পূত চরণ উপর।

১১

কিম্বা সুর পুন্নাগের আদর্শ শোভিছে,
গয়ার শ্রী কণ্ঠে ইহা যেন রৌপ্যহার,
গয়ার বক্ষেতে ফল্গু সৌন্দর্য্যে হাসিছে,
বালুকা দশন খুলি কিবা চমৎকার।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।